রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ
ও
তেভাগা আন্দোলন

সংকলক : শ্রীধনঞ্জয় রায়

রত্না প্রকাশন
১৪/১ পিয়ারীমোহন রায় রোড
কলিকাতা-৭০০০২৭

প্রকাশক ঃ
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে
রত্না প্রকাশন
১৪/১, পিয়ারীমোহন রায় রোড
কলিকাতা-৭০০০২৭

প্রথম প্রকাশ ঃ ২১ নভেম্বর, ১৯৬৯

মুদ্রণে ঃ
শ্রীকান্ত বসাক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

মহান তেভাগা সংগ্রামের বীর শহীদদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

১৯৩৬-১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলায় ক্রমান্বয়ে কৃষক আন্দোলন ব্যাপ্তিলাভ করতে থাকে, এই আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। তা সম্ভব হয়েছিল শিক্ষিত সমাজের ও কৃষক শ্রেণী থেকে আগত অসংখ্য কর্মীব ও নেতার প্রয়াসে। এমনকি জমিদাব ও জোতদার পবিবারের আত্মত্যাগী যুবকেরাও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তখন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁরাই ব্রিটিশ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বিভিন্ন জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন ; শ্রমিক, কৃষক, মহিলা ও ছাত্র ফ্রন্ট সংগঠিত কবে সমাজ জীবনের আমূল রূপান্তরের জন্য আন্দোলন পরিচালনা কবেন। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নেতারা ও কর্মীবা যেভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মতাবোধে আবদ্ধ হন তাতে বাংলার বিভিন্ন শহবে, গ্রামে ও গঞ্জে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। একের পব এক গণজাগরণের ঢেউ বাংলার রাজনৈতিক তটকে প্লাবিত কবতে শুরু কবে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সংগ্রামী মানুষেরা কমিউনিস্ট পার্টিব পতাকাতলে সমবেত হন। তার ফলে কৃষক আন্দোলন দুর্বার গতিবেগ লাভ করল। তুলনায় হিন্দু ও মুসলিম বুর্জোয়াদের শক্তি বেশী থাকায় সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি ইতিহাসের গতিধারা নির্ধারণ করতে পারেনি।

সেই সময়ের গণজাগরণের রূপটি কেমন ছিল তা নিয়ে গবেষণা চলছে। নানা সূত্র থেকে গবেষকরা তথ্য সংগ্রহ করছেন। সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা মূল্যবান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই জাতীয় কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তবুও বহু তথ্য এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। দেশভাগের বিপর্যয়ের ফলে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতারা ও কর্মীরা এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন যে, তাঁদের স্মৃতিকথা সংগ্রহ করা বেশ

কষ্টকর। অথচ তাঁদের কথা জানতে না পারলে 'এলিট' বা 'উচ্চবর্গের' আত্মত্যাগী মানুষের সঙ্গে 'সাবঅলটার্ন' বা 'নিম্নবর্গের' অগণিত জনসাধারণের একাত্মতাবোধের চিত্রটি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে না। কতটা ব্যাপক পরিধি ও গভীরতা নিয়ে এই একাত্মতাবোধ সমাজ পরিবর্তনের পথটিকে প্রশস্ত করেছিল তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের জন্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর স্মৃতিকথা খুবই সহায়ক। সঙ্কলক শ্রীধনঞ্জয় রায় এমনি একটি মূল্যবাণ গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন।

শ্রীরায় দীর্ঘকাল ধরে গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তাঁর বন্ধন অন্তরের। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের কাহিনীগুলো যাতে বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে না যায় তার জন্য তিনি অনলস পরিশ্রম করে চলেছেন। তিনি একক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষক সংগ্রামের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে কয়েকটি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন' এবং 'তরাই ও ডুয়াসের শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ও তেভাগা'। কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনায় তাঁর রচনাসমূহ যে যথেষ্ট সহায়ক হবে তা বলাই বাহুল্য। এই ধরণের একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

অমলেন্দু দে

প্রাক্‌কথন

কৈবর্ত বিদ্রোহ (১০৭৫), সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০) রায়ত বিদ্রোহ, (১৯১৭-১৮) রংপুর জেলাকে সংগ্রামের তীর্থভূমিতে রূপান্তরিত করেছিল। সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যের রেখে যাওয়া স্মৃতি চিহ্নের খাত ধরে পুনরায় এখানে ১৯৩৯-৪০'এ শুরু হয় আধিয়ার বিদ্রোহ এবং পরবর্তীতে ১৯৪৬-৪৭'এ তেভাগা সংগ্রামের ফলে তার একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপ্তি লাভ ঘটে। রংপুরের কৃষকরা তেভাগা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছিল, কৃষক কুলের মধ্যে কী প্রচণ্ড শক্তি নিহিত এবং এই শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারলে কী বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলতে পারা যায়।

মূলতঃ রংপুর জেলার আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলনের সাথে যাঁরা জড়িত ছিলেন—তাঁদেরই কয়েকজনের স্মৃতিচারণা নিয়ে এই সংকলন। এঁদের প্রয়াণে 'তেভাগা' আন্দোলনের অনেক তথ্য লুপ্ত হবে এই আশংকায় বর্তমান সংকলনের পরিকল্পনা। স্মৃতিচারকেরা প্রত্যেকেই এই আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মী ও নেতা। দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যহেতু বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনাসমূহের যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখা তাঁরা এই সংকলনে দিয়েছেন তা ইচ্ছে করেই যথাযথ রেখেছি। এরফলে, ক্ষেত্র বিশেষে বিতর্কের অবকাশও থাকছে। ভবিষ্যতের ইতিহাস সন্ধানীরা সেই বিতর্কের উত্তর খুঁজে নেবেন। এই আন্দোলনের মধ্যে যদি আজকের প্রগতিশীল মানুষেরা কোনো প্রেরণা খুঁজে পান তবে তা সংকলকের বাড়তি পাওনা।

স্মৃতিচারকদের মধ্যে শ্রীপরেশ মজুমদার সম্প্রতি মারা যান। তাঁর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে ব্যথিত। অন্য অন্য স্মৃতিচারকেরা এখনও কোলকাতায়, বালুরঘাটে, নদীয়া, রংপুরে ও শিলিগুড়িতে ছড়িয়ে আছেন। গ্রন্থের শেষে এঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বর্তমান ঠিকানা সংযুক্ত হোল।

শ্রদ্ধেয় ইতিহাসবিদ আচার্য্য অমলেন্দু দে এই সংকলনের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমলয়শংকর ভট্টাচার্য্য বহুবিধ তত্ত্বগত ও তথ্যগত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে অপরিসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ডঃ সনৎ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতার নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। শ্রীমতী শীলা চন্দ্র গ্রন্থটি মুদ্রণের সময় ধৈর্য্যসহকারে প্রুফ সংশোধন করেছেন। তাঁর কাছেও আমি সবিশেষ ঋণী।

যাঁদের প্রেরণায় সংকলন কর্মটি সহজসাধ্য হয়েছে তাঁরা হলেন আমার জননী প্রয়াতা রাণী রায়, পিতৃদেব শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় ও পত্নী শ্রীমতী সুষমা রায়।

প্রকাশনার আর্থিক সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সুহৃদবর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের অকৃপণ ও উদার সহায়তা আমাকে ঋণপাশে আবদ্ধ করেছে।

ধনঞ্জয় রায়

সূচীপত্র

রংপুরের তেভাগা সংগ্রামের কথা

১৯৪২ এর ভারত ছাড় আন্দোলনে আমরা যোগ দেই নি। ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দেই নি এককথায় বল্লে মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থেকে যায়। মাত্র ১০ বৎসর বয়সেই ইংরাজ ভারত ছাড় এই ব্রত উদ্‌যাপনে বুকের রক্তে শপথ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু '৪২-এর ভারত ছাড়'—প্রয়োগক্ষেত্রে হয়েছিল তদানীন্তন অক্ষশক্তি (জাপানের) সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা। কারুর দেশপ্রেমে কটাক্ষ না ক'রে আজ নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে, ওটা ছিল মারাত্মক রকমের একটা ভুল পথ।

এর চুলচেরা বিচার না করেও খুব সহজেই বলা যায় যে, অন্যান্য বহু দেশের মতই 'ভারতের স্বাধীনতা' তাৎক্ষণিক ভাবে হিটলারের বুটের নীচে প্রচণ্ড মার খেতো।

তখন জনযুদ্ধের যুগ। পঞ্চাশের মন্বন্তরে রংপুরের কয়েক লাখ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারিয়েছেন। ঐ সময়ে পার্টির নেতৃত্বে দেশী বিদেশী সাহায্যে সাধ্যমত ত্রাণকাজ করা হয়। জেলার তিন শতেরও বেশি দুগ্ধকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মাতা ও শিশুকে বিনা মূল্যে দুধ বিতরণ করা হোতো। দুধটা অবশ্য আমেরিকার অনুদান। তবে পরিচালনার দায়িত্ব ও আনুসঙ্গিক খরচাদির দায়িত্বে ছিলেন প্রধানতঃ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। জেলা সমিতিতে কিছু লীগনেতা যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী মনোভাব ছিল মারাত্মক রকম বিরুদ্ধে। প্রয়াত কিরণশঙ্কর রায় কথা প্রসঙ্গে একদিন আমাকে বলেন, 'রিলিফ'! বলেন কি? সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটগিরি!' পরে ডাঃ বিধান রায়ের নেতৃত্বে একটি B. M. R. C. C. মেডিক্যাল রিলিফ সমন্বয় কেন্দ্র খোলা হয়। তাতে পার্টির সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

শহরে, বন্দরে ও গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার প্রাথমিক উদ্যোগে

পার্টির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সংকটের ব্যাপকতা ও গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারী সাহায্য আসে। তখন শুরু হয় চুরি। লঙ্গরখানার সঠিক পরিচালনায় পার্টি কমরেড ও কিছু উদারমনা ব্যক্তির কুণ্ঠাহীন ও বিরামহীন সমর্থন পাওয়া গিয়েছে। তত্বপরি ২টি চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়। রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের পরিচালনায় ১টি (হাড়িয়ার কুটি) কেন্দ্র প্রায় দু'বৎসর কাল সময় বিনা মূল্যে চিকিৎসা চালায়। জরীপে দেখা যায় দুর্ভিক্ষের পর প্রায় ৬ মাস কাল হাড়িয়ার কুটি (সদরে) ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে পুষ্টিহীনতায় নতুন সন্তান জন্মে নাই। ডাঃ নীলকান্ত দত্ত ও কমঃ কালিপদ বর্মণ (ডাক্তার)-এর নাম ঐ এলাকার জনসাধারণ এখনও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বর্তমানে সেখানে একটি হাট বসে, নাম 'সেণ্টারের হাট'।

দুর্ভিক্ষের পরেই আসে মহামারী আকারে বসন্ত রোগ। সাধারণতঃ একবারের বেশী বসন্তের আক্রমণ হয় না, প্রতিষেধক শক্তি (immunity) শরীরে জন্মে। কিন্তু তিস্তা অঞ্চলে কমঃ সুধীর মুখার্জীর সঙ্গে ঐ অঞ্চল পরিদর্শনে বেড়িয়ে একই ব্যক্তিকে তিনবার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা দেখেছি; গ্রামকে গ্রাম উজাড়; বাড়ীতে ঢুকে জিজ্ঞাসা করায় মৃতের সংখ্যা জানানোর জন্য ২'১ জন যারা জীবিত ছিলেন (প্রায় ক্ষেত্রেই আক্রান্ত) অঙ্গুলি দিয়ে কবর দেখিয়ে দিতেন। নতুন, পুরানো কবর গুনে বুঝতে হোতো মৃতের সংখ্যা।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বসন্ত মহামারীতে বেশী প্রাণহানি হয় শুশ্রূষা ও পথ্যের অভাবে। ওষুধের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। বসন্তের কথা শুনলেই পাড়ার লোক সে বাড়ি আসা যাওয়া বন্ধ করতো। এমনকি বাড়ির লোকও পালিয়ে যেতো। মশারির অভাবে মাছি যেমন সংক্রামণ ছড়াতো তেমনই ঘা'তে পোকা জন্মাতো। এতেও যারা বাঁচতো তাদের শরীরে ক্ষত শুকানোর সময় যে মারাত্মক 'টান' ধরতো এবং তৈলাক্ত পদার্থের অভাবে সেই 'টানে' তারা মারা যেতেন। গঙ্গাচরা থানার লক্ষ্মীটারীর কবিরাজ কমরেড সীতা বর্মণ এ্যান্টিসেপটিক তেল

বানিয়ে মহামারী অঞ্চলে থেকে হাজার হাজার রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। কমরেড সীতা বর্মণ নিজ হাতে ঘা থেকে পোকা বের করে, ধুয়ে মুছে তেল লাগাতে সংকোচ বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ কখনও করেন নি।

এসব সত্ত্বেও সামান্য কিছু মুসলিম অঞ্চল ছাড়া ব্যাপকতর মুসলিম কৃষকের মধ্যে আমরা ঢুকতে সমর্থ হই নি। তবে ক্ষত্রিয় কৃষকের হৃদয়ের অন্তস্থলে পার্টি ও কৃষক সমিতি প্রবেশে সমর্থ হয়েছিল। সাধারণ ক্ষত্রিয় কৃষক এমনকি স্থানীয় মধ্যস্তরের শ্রদ্ধেয় নেতারা পর্যন্ত কৃষক সমিতি, পার্টি বা উভয় সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারী মহলে কথা ছিল 'প্রতিটি ক্ষত্রিয়ই কমিউনিষ্ট'। ১৯৫৪ এর পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রণ্টে 'কমিউনিষ্ট' নেওয়া হয় না। পার্টির নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। রংপুরের 'সিডিউল' শমন তুটিই পার্টি পায়। নীলফামারীর অভয় পণ্ডিত কপর্দ্দক শূন্য প্রাইমারী শিক্ষক, লড়তে হয়েছিল লীগ সমর্থিত অন্যতম ক্ষত্রিয় বড় জোতদার হিরম্ব রায়ের বিরুদ্ধে। 'যাতু মিঞা—হিরম্ব' জোটের বিরুদ্ধে পার্টির প্রকাশ্য সভা সমিতি করা বা পোষ্টার লিফ্‌লেটের অর্থ ছিল না। মাত্র ২৮ বৎসরের ব্যবধানে শুধু 'টিচ্‌', পার্টির ক্ষুদ্রপত্র 'টিচ্‌' নিয়ে কমরেড সথারউদ্দীন গোপনে জানিয়ে এলেন, অভয় পার্টির লোক, তাকেই ভোট দিতে হবে। হিরম্ব বহু ভোটে হেরে গেল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর: পলায়নপর বৃটিশ-রণনীতি 'পোড়ামাটির' নীতির মারাত্মক ফল। "কর্ডন" প্রথার ফলে খাদ্যশস্য স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ। মহা সুযোগ। নতুন ধনীরা "হোর্ডিং" (মজুত করা) শুরু করে দিল অবশ্যই অন্যায়ভাবে।

ঐ সময় ডোমার থানার ভোগ-ভাবরির সংলগ্ন পুর্ণিয়া জেলায় খাদ্য-শস্যের অভাব ছিল না। কিন্তু কর্ডন, আনার উপায় নাই। বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান জোতদারের বাস এই গ্রামে। জনৈক জোতদারের শুধু বাড়ির বাইরের অংশে ঐ সময় নিজে গুনেছি বড় আকারের ১৪টি ধানের গোলা। অথচ মাত্র দেড়-তুই মাইল দূরে ঐ গ্রামের প্রান্তে

একটা গোটা পাড়া দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে কঙ্কালগুলি রোদবৃষ্টিতে সাদা হয়ে পড়েছিল।

নীলফামারী মহকুমায় বড় জোতদারের সংখ্যাও যেমন বেশি তেমনি অনাহারে মৃতের বিভীষিকাও ভয়ঙ্কর। অনাহারে দুর্বল আদম সন্তান খাদ্যের অন্বেষণে হামাগুড়ি দিয়ে বড় রাস্তায় এসে রাতের অন্ধকারে গরুর গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারাতো। মনুষ্যাকৃতি অস্থিচর্মসার মায়েরা চামচিকার বাচ্চার মত শিশু সন্তান বুকে জড়িয়ে বন্য জন্তুর মত খাবার খোঁজে ঘরবাড়ি ছেড়ে দলে দলে ঘুরে বেড়াত। অনাহারে মৃত প্রায় নিজ সন্তানের মুখ থেকে খাদ্যকণা কেড়ে নিয়ে মাকে খেতে দেখেছি।

হ্যাঁ, জেলাব্যাপী মজুত উদ্ধার অভিযান হয়েছে কৃষক সমিতি ও পার্টির উদ্যোগে। গাইবান্ধার কমরেড ফজলকে নিজ গোলা থেকে ধান বের করার জন্য তার বাপ তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। রংপুর শহরের উপকণ্ঠে রাজেন্দ্রপুরের নঙ্গরখানার 'চোরা চাল' ধরার জন্য কমরেড অন্নদাকে ডাকাতির মামলায় পড়তে হয়।

উপরোক্ত আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নাৎসী বাদের চড়ান্ত পরাজয় এবং দুনিয়াব্যাপী নতুন যুগের সম্ভাবনাময় পরিস্থিতিই মহান তেভাগা আন্দোলনের পটভূমি।

আধিয়ারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: তেভাগার প্রস্তুতিপর্বে স্থানীয় পার্টি ও কৃষক সমিতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমাকে ও কমরেড মোকসেদকে জেলা কমিটির নির্দেশনামাসহ ডিমলা (রংপুরের প্রধান তেভাগার অঞ্চল) পাঠান হয়। প্রাথমিক আলোচনার পর ভারপ্রাপ্ত কমরেড মহী বাগচী ও স্থানীয় নেতা হরিকান্ত সরকার প্রভৃতি সহ সরজমিন জরীপে যাই।

কাঁচা ও আধপাকা ঢাকা প্রান্তর, দিগন্ত বিস্তৃত। হেমন্তের তেজহীন সূর্য আর পাশে প্রবাহিত কোমলাইয়ের (তিস্তার শাখা) সুশীতল হাওয়া আমাদের চলার পথে সহায়ক ছিল।

এক অপূর্ব দৃশ্য। উপরে সুনীল আকাশ, এখানে ওখানে জলহীন মেঘের ভাসমান সাদা টুকরো। দূরে উত্তরে হিমালয়ের নীলিমা এবং শিখরে বরফে পড়া রোদের রঙের খেলা। ডানে বামে সামনে চারদিকে ধানের সমারোহ। ধান ভারে অবনত শীষ গাছগুলি যেন কৃষকের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যস্ত। জল নেমে গিয়েছে, অনেক জমির ধান গাছই মাটিতে লুটিয়ে। আশ্বিন-কার্তিকের অনাহারী চাষীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কৃষকের কাস্তে ও কিষাণীর উরুণ গাইনের (ধানভানা আদিম যন্ত্রবিশেষ) প্রতীক্ষায় যেন এরা এক কদম এগিয়ে আছে, প্রচুর ফলেছে, ধানে গাছ ঢাকা পড়েছে, 'মা লক্ষীর কিরপা'।

প্রায় গোটা মাঠটাই অমুক মিঞা কিংবা অমুক বাবুর অর্থাৎ জোতদারের। চাষ হয় আধিয়ারী প্রথায়। একখণ্ড জমির আধিয়ারের নাম খোঁজ করায় উত্তর এলো এ্যাইটে গ্যাইচে ভোটানত। কেমন? 'ভাঙ্গা কান্তাই মাথাত্ দিয়া, বনুষের হাত ধরি, ছাওয়া কোলত করি, ঐ-ই ই হুত্তি হুত্তি'। তিস্তার অপর পার ডয়ার্সের দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে একজন চীৎকার করে বল্লেন। অর্থাৎ লোহার ভাঙ্গা কড়াই দিয়ে মাথা ঢেকে স্ত্রীর হাত ধরে শিশু সন্তান কোলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে দেশান্তরী হয়েছেন। ক্যানে? 'দেনার ভয়ত্'।

সম্বৎসরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষা না করে পাকা-সোনা মাঠে ফেলে চাষী তার যথাসর্বস্ব ভাঙ্গা কড়াই সম্বল করে দেশত্যাগী হয়েছেন। বিরল দৃষ্টান্ত নয় বরং স্বাভাবিক। কারণ, ব্যবস্থাই এমন যে ঘোড়ার খরচ, খোলান খরচ, পাইকের খরচ প্রভৃতি ৮।১০ রকম আবুয়াব কেটে রাখার পর অর্ধেকের অংশীদার আধিয়ার প্রায় ক্ষেত্রেই খালি ডালা কুলো হাতে বাড়ি ফেরেন। ধানকাটা, জোতদারের খোলানে বহন করা, ঝাড়াই-মাড়াই, গোলাভর্ত্তি (জোতদারের) প্রভৃতি কাজ, উপরন্তু, পুরোটাই 'বেগার'। বেঁচে থাকার তাগিদেই আরও নির্মম শর্তে আগাম মজুর বিক্রী করে নতুন

ঋণজালে জোতদারের কেনা গোলাম হতে হয়। ভোটান ছাড়া গত্যন্তর কি ?

অসংগঠিত জনতা দুর্বলতার উৎস ঃ সেদিন ছিল স্থানীয় হাটবার। হাটবারে কৃষকের বড় জমায়েত সম্ভব না। তদুপরি লাঠিধারী সংগঠিত ভলান্টিয়ার বাহিনীর পাহারা ছাড়া 'তেভাগার' ধানকাটা নেতৃত্বের নির্দেশে নিষিদ্ধ ছিল। ঘরে বসে রিপোর্ট লিখছিলাম। পাশে বসে কমরেড বিপিন বর্মণ, ভালো জঙ্গী কমরেড। দেশবিভাগের পর পুলিসের তাড়নায় সীমান্ত অতিক্রম করেন, কোথায় কেমন আছেন জানি না। বেলা ১০টার দিকে খবর এলো টারীর (পাড়ার) জনৈক কৃষক পরিবারে লোকজনের সহায়তায় ধান কাটছেন। বিপিনকে পাঠিয়ে নিষেধ করা স্থির করেছিলাম। কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব বোধে নিজেই বিপিনের সঙ্গে গেলাম। আমরা পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার পিঠে বন্দুক হাতে জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে লাঠি, বল্লম এবং হোরা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত ১০।১২ জনের আর একটি দল ওখানে হাজির। একেবারে মুখোমুখি। কেটে পড়ার পথ নেই। যতটা মনে আছে ফাঁকা মাঠের মধ্যে ২।৩টি কুঁড়েঘরের একটি মাত্র বাড়ি। আমরা দু'জন দো-চালার দু'টি কুঁড়েঘরের মাঝে আশ্রয় নিলাম। সামনে বিপিন। হাতে মাত্র বাঁশের একখানি কঞ্চি।

বড় লাঠির আঘাতে হাত জখম হয়ে বিপিনের হাতের কঞ্চি মাটিতে পড়ে যায়। বিপিন পিছনে সরে আসেন। কঞ্চিটা তুলে নিয়ে আমি বাড়ীর পথ আগলে দাঁড়াই। বাড়ীর পুরুষরা কেটে পড়েছে। ভিতরে শিশু ও মহিলার আর্তনাদ। সামনে অদূরে হাটযাত্রী, কিছু লোকের জনতা ২।৪ জন চেনামুখও দেখা যায়। আশা ছিল পিছনে বিপদ বুঝলে শত্রুবাহিনী সরে পড়বে। নিরীহ আধিয়ার পরিবার লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পাবে।

অসংগঠিত জনতা নীরব দর্শকের ভূমিকা নিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বড় লাঠির আঘাতে আমার মাথার কয়েকটি

ক্ষতস্থান থেকে রক্তের স্রোত চোখমুখ ঢেকে দেওয়ায় পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করি।

বিকৃত তথ্যের আশঙ্কা ঃ প্রায় চার দশকের পুরানো ঘটনা। বিশেষভাবে যাচাই করার সুযোগ না নিলে ঘটনার মারাত্মক বিকৃতি হ'তে পারে। উপরোক্ত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে অনুজপ্রতিম জনৈক বন্ধু তার পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন, 'আমি ঘরে বসে কথা বলছিলাম। ইতিমধ্যে জোতদারের কিছু লোকজন এসে আমাকে বাইরে আসতে বলায় আমি বাইরে আসি এবং সেই সুযোগে তারা আমার মাথায় আঘাত করে'। কোথায় পেলে? উত্তরে, কেন আপনিই ত বলেছেন। তিনি আরও বল্লেন, পরবর্তীকালে আমাকে নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, জোতদারের কথায় আপনি (আমি) বাইরে গেলেন কেন? এবং উত্তরে নাকি বলেছিলাম 'ভদ্রলোক ডেকেছে, না যেয়ে কি করি'? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কমরেড অবনী বাগচী এই সময় বাইরে থেকে এসে সক্রিয় অংশ নেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চিকিৎসার জন্য আমাকে বাইরে পাঠানো হয়। প্রতিবাদে বড় বড় জঙ্গী বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। শ্লোগান ওঠে—'ধান কেটে ঘরে তোলো এবং দখল রেখে চাষ করো''। প্রথমে ব্যবস্থা ছিল জোতদার সম্মত হলে জমিতে ভাগ হয়ে তার ⅓ অংশ নিজ খরচে নিয়ে যাবে। এতদিনকার প্রচলিত ব্যবস্থা, জোতদারের খোলানে ধান তোলার প্রথা বর্জিত হ'লো। সত্যিকারের লড়াই শুরু হলো। শত সহস্র লাঠিধারী সংগঠিত ভলান্টিয়ার বাহিনীর প্রহরায় 'তেভাগার ধান-কাটা অভিযান দ্রুতগতিতে এগিয়ে চল্লো।

সাংকেতিক ব্যবস্থা ঃ বিপদের আশঙ্কাতেই স্থানীয় লোকজন 'শোর' (জোরে চীৎকার) তুলবেন। 'শোর' শোনামাত্র অন্যেরা 'শোর' তুলবেন এবং লাঠি হাতে শোরের উৎসমুখে ছুটে যাবেন। দীনদয়াল ও কালাচাঁদ ছিল শত্রুপক্ষের আতঙ্ক। ওরা আসছে শুনলেই শত্রু-বাহিনী রণে ভঙ্গ দিত। ইতিমধ্যে আমি কর্মস্থলে ফিরে আসি।

এতদিন সংগঠিত এলাকাতেই ধানকাটা সীমাবদ্ধ ছিল। আর ঐ অঞ্চল ছিল (হিন্দু) ক্ষত্রিয় প্রধান। কয়েকটি ক্ষুদ্র মুসলিম এলাকা বাদে জেলা কৃষক সমিতি ব্যাপক মুসলিম কৃষকদের মধ্যে তখনও ঢুকতে সমর্থ হয় নি। সাম্প্রদায়িক পরিবেশ ও আমাদের অক্ষমতা অবশ্যই এর জন্য দায়ী।

এখন জিন্নার মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্বের মজবুত বাঁধে ফাটল দেখা দিল। সংগঠিত এলাকার বাইরে থেকে বিশেষ করে মুসলিম কৃষক অঞ্চল থেকে তেভাগার ডাক আসতে শুরু করলো। 'আমরা প্রস্তুত' নেতা পাঠাও' ইত্যাদি।

ষড়যন্ত্রের নতুন মোড় : এতদিন 'হুইলে চোয়াল' কীর্ত্তন প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষকের ঐক্য বিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার চলতো। এখন পুলিশের সহায়তায় হত্যা (তন্নারায়নের হত্যার সময় পূর্বব্যবস্থা মত সংশ্লিষ্ট জোতদারের বাড়িতে জনৈক দারোগার নেতৃত্বে একদল রাইফেলধারী পুলিস হাজির ছিল) এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার (সৈয়দপুর) ব্যবস্থা হ'লো।

তন্নারায়ণ হত্যা : সেদিন স্থানীয় কোন 'প্রোগ্রাম' ছিল না। নেতারাও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে। সম্পূর্ণ সুস্থ না বলে আমাকে কিছুটা বিশ্রামে রাখা হয়েছে। ভর সন্ধ্যা। সূর্য্য অস্ত গিয়েছে পশ্চিম-আকাশের লালটা তখনও অন্ধকার গ্রাস করে নি। আমার 'ডেন' (আশ্রয়স্থল) এর পশ্চিমদিকে খোলামাঠে একা একা পা চারি করছিলাম। গ্রাম পুরুষ শূন্য বাজারে কিংবা মাঠে। আরও দূরে পশ্চিমে প্রায় আধমাইল দূরে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। বড় বড় জোতদার পাড়ার সংলগ্ন ওদিকে তো ছোট একটি আধিয়ার পাড়া। সংবাদের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাকাদাড়ি লাঠি হাতে জনৈক প্রৌঢ় মুসলিম কমরেড (নামটি স্মরণ নেই) হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে হাজির। খিব্—খারাপ—খবর। জোতদারের ঘর যাদুমিঞা (মশিউর রহমান) বন্দুকের গুলিতে তন্নারায়নক খুন

করিচে ; (তন্নারায়ণ) বারান্দাত্ বসি আছিল ; টারীর মানুষ বাজারে ইতি উতি ; পুরুষরা কাঁহই আছিল না। লাশ বারান্দাত্ পড়ি আছে, বাচ্চাই-এর ঘর আগত গেছিল, তার ঘরক্ও গুলি করিচে ; অরা জখম হইচে, মাঠ্ত পড়ি আছে। হামরা শালার ঘরক তাড়াইয়া পিটাইয়্যা দিনু। পুলিশ আসচে। তোমাক খবর দিবার আনু।

ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। কমরেডও সঙ্গে গেলেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় কিছু লোকজন এসেছেন। কমরেডরাও আসতে শুরু করেছেন। শহীদ তন্নারায়ণকে লাল সালাম জানাই। তিনি বারান্দায় পড়ে আছেন। বাচ্চাই শেখ সহ আরও কয়েকজনকে আহত অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকতে দেখি। কলকাতার প্রখ্যাত সাংবাদিক কমরেড গোলাম কুদ্দুস ঐ রাতে ঘটনাস্থলে আসেন। উল্লেখ্য যে, আসল খুনীর সহোদর ভ্রাতা পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জানান যে, তার প্রয়াত সহোদর অগ্রজ (বড়বাড়ির) জনৈক জোতদার যুবকের গুলিতেই তন্নারায়ণ শহীদ হন। তবে গুণ্ডাবাহিনীর নেতৃত্বে যাদুমিঞা ছিল, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

পুলিশের আশ্রয়ে : সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরে বসে থাকা নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে হত্যা ! গুণ্ডাবাহিনীর এহেন জঘন্য কাজে জনসাধারণের ক্ষোভ ও ক্রোধ ফেটে পড়লো। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ মিছিলে 'যাদুমিঞার কাল্লা চাই' ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললো। শীতের শুকনো মাটি। যাদুমিঞার কাল্লা চাই, তন্নারায়ণের হত্যার বিচার চাই প্রভৃতি চকের (খড়িমাটির) লেখায় রাস্তা, মাঠ প্রভৃতি জায়গা ভরে গেল। 'যাদুমিঞার কাল্লা চাই' দাবীতে জঙ্গী বিক্ষোভ মিছিল যাদুমিঞাদের পাড়ায় ঢুকে পড়লো।

জনতার রুদ্ররোষের মুখে জোতদারকুল ভীত সন্ত্রস্ত ; গা ঢাকা দিল ; দূরে আত্মীয়স্বজন ও শহরের সরকারী কর্মচারীদের গৃহে আশ্রয় নিল। তদানীন্তন জলপাইগুড়ির জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যাদুমিঞার

ভগ্নীপতি যাদুমিঞাকে আশ্রয় দিলো। হুলিয়ার আসামী সরকারী বাংলোয় আশ্রয় পেলো।

সমস্যা সমাধানে শ্রেণীসচেতন সংগঠিত জনতার সহস্রপথ ঃ তন্নারায়ণ হত্যাব প্রতিবাদে নেতৃত্বেব নির্দেশে মহকুমা শহব নীলদামারীতে একটি বড় 'র‍্যালী' (সমাবেশ) অনুষ্ঠিত হয়। আপ-ডাউনে প্রায় ৪০-৪৫ মাইলেব পরিক্রমা। ডিমলা, ডোমার, হরিণ চরা (আবও একটি তেভাগা অঞ্চল), নীলদামাবী।

শীতের দুপুব। কমরেড অবনী বাগচী, মহী বাগচী, হরিকান্ত সবকার, প্রয়াত চাড্ডি মহম্মদ, ছকৃদ্দি মিঞা, বাচ্চাই শেখ দীনদয়াল বর্মণ, কালাচাঁদ বর্মণ প্রভৃতিব নেতৃত্বে লাঠি ও লাল ঝাণ্ডাধাবী কয়েক হাজার ভলান্টিয়াবের এক সংগঠিত বাহিনী। হাঁটাও—না—মার্চও না ঃ প্রায় দৌড়, কাক যেমন যায় সরলবেখায় তেমনি ডোমারের দিকে। শ্লোগান—তেভাগা দিতে হবে তন্নারায়ণ হত্যার বিচার চাই, যাদু মিঞার ফাঁসী চাই, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ প্রভৃতি। পথঘাটের তোয়াক্কা নেই। বন প্রান্তর ভেঙ্গে ছুটছে ডোমারের উদ্দেশ্যে, লাঠির ডগায় বাধা লাল নিশানের এক বিরাট মিছিল। পথ প্রান্তের দু'ধার থেকে যোগ দিচ্ছে, লাঠি হাতে স্বতঃস্ফূর্ত জনতার এক অবিরাম স্রোত। জনৈক চৌকিদারকে নিজ ছেলেকে বলতে শোনা গেল—"যা ক্যানে লাঠি খ্যান ধরি"।

ধুলিধুসরিত পথ ক্লান্ত মোর্চা ডোমার পেঁছালো। তখন সবে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। তদানীন্তন ডোমারের পার্টি শাখা বেশ শক্তিশালী। কংগ্রেসীদের একটা বড় অংশ পার্টিতে। "ক্যুরিয়ার" (বার্তাবাহকের) এর মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল। প্রয়াত কমরেড পাঁচু তুড়ি, গোলাম আজিজ, সাদা মিঞা, বলরাম সাহা, নারায়ণ ব্যানার্জী প্রভৃতি কমরেডগণ আগ বাড়িয়ে বন্দরের উপকণ্ঠে লাল সালাম জানিয়ে মোর্চাকে স্বাগতম্ করলেন। স্থানীয় পার্টির প্রচেষ্টায় ও দেশপ্রেমিক বন্দরবাসী এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের

সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে ৫।৬ সহস্র লোকের একবেলার এক মুঠো খিচুরির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল।

পাটের বন্দর ডোমার। খালি গুদামগুলিতে ব্যবস্থা হয়েছে। মজ্‌লিস রান্না করা বড় বড় তামার ডেগচিতে চাল, ডাল আর যা যা তরকারী জুটেছিল সব এক সঙ্গে সিদ্ধ হচ্ছে। কার্যকারণ বুঝতে বেশী বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া, তখনকার ডোমার জোতদার প্রধান ও মোস্‌লিম লীগের শক্তিশালী এক ঘাঁটি। ইতিমধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে একসঙ্গে রান্না হিন্দু ও মুসলমান খাবে কি করে?

নেতারা সমস্যা সমাধানে স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে মিটিং-এ বসে গেলেন। সকলেরই গালে হাত। উপায় কি? হঠাৎ দিগন্ত কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠলো—"দাড়ি টিকি ভাই ভাই, লড়াইয়ের ময়দানে জাতভেদ নাই।" সমস্যা বিরাট, সমাধানও তড়িৎগতিতে এবং চুড়ান্ত। হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে হিন্দু মুসলিম গরীব কৃষক জনতা পাশাপাশি বসে, পরস্পরকে পরিবেশন করে, মহাতৃপ্তির সঙ্গে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলো। বিভিন্ন শ্লোগানে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ঘোষণার সাথে যে যেখানে পারলো পাটের গুদামে, রাস্তার দু' পাশে; দোকানের খোলা বারান্দায়, ঘুমের কোলে ঢুলে পড়লো।

পরের ভোর। পূর্ব ব্যবস্থামত কাকডাকা ভোরে সকলেই প্রস্তুত। ডোমারের কমরেড রাও সঙ্গে। "লালঝাণ্ডা জিন্দাবাদ", কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ, তেভাগা দিতে হবে, তন্নারায়ণ হত্যার বিচার চাই, কংগ্রেস-লীগ এক হও, বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ, দুনিয়ার কৃষক-মজুর এক হও, দাড়ি টিকি ভাই ভাই, প্রভৃতি সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত শ্লোগানে বন্দরবাসীর শীতের ভোরের সুখ নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। লাল তরঙ্গ আবার ছুটলো প্রায় ১৫ মাইল দূরে নীলফামারীর উদ্দেশ্যে। সময় একেবারে মাপা। র‍্যালীর পর দিনের আলোয় ফিরতে হবে যার যার ঘরের পানে।

হরিণচরা। ক্ষণিক বিশ্রাম। যোগ দিলেন স্থানীয় কিছু জনতা ও লাঠি ঝাণ্ডা হাতে ভলান্টিয়ার বাহিনী। শ্লোগানের পর শ্লোগান

আর গতিবেগ ও কলেবর বৃদ্ধি মোর্চার। চোখে মুখে ভয় বা শঙ্কার লেশমাত্র নেই। জনসমষ্টি একখণ্ড জমায়িত বস্তুর মত ছুটে চলেছে। সামনে উদ্দেশ্য এক তেভাগা নিতে হবে, তন্নারায়ণের হত্যার বিচার চাই।

নেতৃত্বের মনে? অনেক প্রশ্ন—অনেক সমস্যা। ডোমার জোতদার প্রধান বন্দর। বন্দরের চিকনমাটি, পাড়ার জোতদারবরা লীগপন্থী ও শক্তিশালী। একই পাড়ার প্রয়াত কমরেড গোলাম আজিজকে এরা 'একঘরে' করেছিল। তাছাড়া, ডিমলার পলাতক জোতদাররা অনেকে এদিকে আশ্রয় নিয়েছে। নীলদামারীর পথে সোনা রায়। মুসলিম ও বড় জোতদার প্রধান গ্রাম। জিলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি আমার বন্ধু প্রয়াত মৌলানা আফ্‌ফেন্দি সাহেবের গ্রাম। এদের অনেকেই 'দেহকদ্‌পন্থী' তদানীন্তন সর্বভারতীয় কংগ্রেসীনেতা মরহুম মৌলানা কেফায়েতুল্যা সাহেবের শিষ্য। কিন্তু সকলেই বেশ বড় জোতদার। এ অঞ্চলের তেভাগার লড়াই মূলতঃ এদেরই এবং এদের নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। পরবর্তীকালে 'তেভাগায়' অংশগ্রহণকারী জনৈক নজির মিঞাকে এরা মিথ্যা ডাকাতির মামলায় সাত বৎসর সশ্রম জেল খাটিয়েছিল। এবং প্রখ্যাত কমরেড পাঁচুতুড়ি এদের চক্রান্তে মারাত্মক আহত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

নীলফামারীও জোতদার প্রধান শহর। এখানে ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী পর্যন্ত প্রায় সকলেই জোতদার। কংগ্রেসনেতা ডাঃ তারক চক্রবর্তী, উকিল চারু ঘোষ, সুরেন দাস প্রভৃতি সকলেই বড় জোতদার। খাদরী হরিপদ সরকার গেঞ্জির (জাপানি) কলের মালিক। গান্ধীপন্থী ও সুভাষপন্থী সকলেই জনযুদ্ধ বিরোধী। তাছাড়া, মুসলিম লীগের এটা শক্তিশালী ঘাঁটি। ডাঃ মনোজ ঘোষ, কমরেড বিমল ভৌমিক প্রভৃতির নেতৃত্বে এখানকার পার্টি শাখা খুবই ছোট ও দুর্বল। অদূরে সৈয়দপুরে শক্তিশালী রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের প্রধান অফিস। এদেরই প্রচেষ্টায় বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু '৪৬-এর

প্রাদেশিক আইন সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু অবাঙ্গালী প্রধান এই রেল শহর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এক উর্বর ভূমি বলে চিহ্নিত। গোটা রংপুর জেলায় যে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল সবগুলিই সৈয়দপুর ও নীলফামারীতে।

লাল তরঙ্গ পৌঁছানোর আগের দিন সৈয়দপুরে দাঙ্গা শুরু হয়। পরের দিন র‍্যালী এসে উপস্থিত হয় নীলফামারীতে, এসব মিলিয়ে নেতৃত্ব চিন্তাগ্রস্তও সর্তক।

হরিণচরায় সুসজ্জিত ভলান্টিয়ার বাহিনীর যোগদানে নতুন দেশের সৃষ্টি হলো। বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে মোর্চা এগিয়ে গেল। বর্ষার দু'ধার থেকে আসা স্রোতের মত স্বতঃস্ফূর্ত জনতার স্রোত মোর্চার আকার-প্রকার এবং উদ্যম ও উদ্দীপনা ক্রমবর্দ্ধমান হারে বৃদ্ধি করে চল্লো।

শোগামাছা (শহরের) হাটের দিন। কাঁচা রাস্তা ধুলায় মানুষ-জন চেনা যায় না। ধুলির ঝড় আর নিযুত কণ্ঠের আকাশ কাঁপানো ধ্বনি। মুহূর্তের মধ্যে দোকানি দোকান ফেলে আর ক্রেতা হাট ছেড়ে পালিয়ে গেল। চোখে-মুখে সবারই আতঙ্ক। এক রব, ঐ আসছে রে.........আসছে রে।

নতুনরূপে গণতান্ত্রিক শক্তি : সামনের সারিতেই ছিলাম। দু'পাশের জানলা থেকে উল্লাসের ধ্বনি কানে এলো। আরে লাল ঝাণ্ডা......... লাল ঝাণ্ডা রে.........। ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে সাম্প্রদায়িকতার চরম শত্রু এক নতুন গণতান্ত্রিক শক্তি। শ্রেণীসচেতন হিন্দু মুসলমান কৃষকের বলিষ্ঠ হাতে ধরা লাল ঝাণ্ডার তাৎপর্য বুঝতে কালবিলম্ব হ'লো না। রাস্তার দু'ধারে দাড়িয়ে সকলে হাসিমুখে স্বাগত জানালেন।

বিদ্যুৎগতিতে প্রোগ্রাম সমাধা করা পার্টির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনুসারে নগর প্রদক্ষিণরত মোর্চা ছোট্ট শহর নীলফামারী লাল ঝাণ্ডায় ঢেকে ফেল্লো। চারদিকে লাল আর লাল এক অপূর্ব দৃশ্য।

মাঠে জনসভা। প্রখ্যাত কৃষকনেতা প্রয়াত কমরেড দীনেশ

লাহিড়ী সভাপতি। প্রস্তাবের সারমর্ম : গরীবের তেভাগা আন্দোলন নস্যাৎ করার চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমান জোতদারের মিলিত ষড়যন্ত্র—এই দাঙ্গা। হিন্দু কি মুসলমান একজন গরীব খুনের বদলা ৭টি (জোতদার)! তেভাগা দিতে হবে এবং তন্নারায়ণ হত্যার বিচার চাই ইত্যাদি। সভাপতির প্রস্তাব অযুত লাঠির—শক্রর—প্রাণ কাঁপানো ঠক্‌ঠকানি শব্দে ও অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ, কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ প্রভৃতি শ্লোগানের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'লো। দাঙ্গা থেমে গেল। গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা আতুরেই মারা গেল।

জেলার আরও দুটি অঞ্চলে তেভাগার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। এক, জলঢাকা—কিশোরগঞ্জ থানা এলাকায় শক্রপক্ষ পুলিশের সহায়তায় পূর্বাহ্নেই হামলা শুরু করে। খুব সম্ভবত আমাদের প্রস্তুতি নিতেও বিলম্ব হয়। আন্দোলন এগুতে পারে নি। অমানুষিক হামলায় বহু গরীব কৃষক ঘরবাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়। দুই, বদরগঞ্জের মধুপুর ইউনিয়নে শ্রেণীসংগ্রামের দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ছিল ভাসা ভাসা।

মানবেতর জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের বাসনা : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ (ডিমলার) জোতদারকুল রণে ভঙ্গ দিল। দেশ ত্যাগের হিড়িক বাড়লো। ধান ষোল আনাই আধিয়ারের ঘরে। জোতদারের ঘরে একমুঠিও যায় নি। ডিমলার প্রচণ্ড শীত। আগুনের চারপাশে বসা জনৈক কমরেডকে বিমর্ষ দেখে প্রশ্ন করায় কারণ জানা গেল—'আতত্ নিন্দ্ হয় না'। ক্যানে? 'মা লক্ষ্মী ঘরত, ঘর ভাঙ্গা, চোরের ভয়'।

সর্বহারার হারানর কিছুই ছিল না। নিঃশঙ্কচিত্তে, খালিপেটে, দিনের হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর, সে এতদিন রাতে, অচেতন হয়ে পড়ে থাকতো। আজ ভাঙ্গা কুড়েতে একমুঠো ধান ; ভয় আছে বৈ-কি? এরা নিজেরাই ছাকরবন্দ্ (ঘরের কাজ করেন)। ধনীর যাবতীয়

ঘরের কাজ এরাই করেন। তাছাড়া, এ সব কাজে পারস্পরিক সাহায্যের ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে চালু আছে। এদের প্রয়োজন হয় নি, বোধশক্তিও কাজ করেনি। সমিতির মিটিং-এ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ায় অল্প আয়াসেই রাতে সুনিদ্রার ব্যবস্থা হ লো।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় ঐ সময় প্রায় ছয় মাসকাল তাদের খুবই দুঃসময় গিয়েছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি কোন 'কেসই' থানায় যায় নি। ঘরে ঘরে ভাত আর পাড়ায় পাড়ায় লাঠিধারী পাহারা প্রয়োজন ও সুযোগ দু'-এরই অভাব। স্থানীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ডিমলা শাখা থেকে দাবি উঠলো, ধনীর ছেলেমেয়েদের মত তাদের সন্তানসন্ততির জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে পার্টি কমরেডকে।

দ্বিতীয় দাবি, মুড়ি ভাজা শেখাতে হবে। মুড়ি খাওয়া এদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিলাসিতা, এক সৌভাগ্য। ভাতই জোটে না, মুড়ি খাওয়ার সুযোগই বা কোথায়? আর ভাজা শেখার প্রয়োজনই বা কি? কাটার মরশুমে একদল চতুর ব্যবসায়ী ধানের ক্ষেতে মুড়ি বিক্রী করে। বাঁশের বা বেতের একডালা মুড়ির বিনিময়ে ঐ 'ডালা' ভর্ত্তি ধান, দিনে ডাকাতি! এদের মুড়ি খাবার সৌভাগ্য ঐ কয়েক দিনের মাত্র। এ প্রসঙ্গে কমরেড রাণী মুখার্জীর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। শহুরে মহিলা কমরেডদের মধ্যে তাঁরই অবদান বোধকরি সর্বাধিক।

নতুন বিপদের সূচনা: সরকার এবার সরাসরি মাঠে নেমেছে। রংপুরের ডি এম. তখন ইছাহক্ সাহেব। আই. ডি. আর. (ভারত রক্ষা আইন) তূনীর থেকে বের করা হলো। প্রকাশ্য কমরেড প্রায় সকলই আটক হলেন। রাতের অন্ধকারে গ্রামাঞ্চলেও আচম্বিতে হামলা চলতে থাকলো। গ্রামাঞ্চল তখন মুক্ত এলাকা ও জোতদার এলাকায় বিভক্ত। ডিমলার জোতদার রমেশ এমনই একদিন স্ত্রীর হাত ধরে তিস্তার অপর পারে ডুয়ার্সে পালিয়ে যাচ্ছে। রমেশের

'ঢ্যানা' চাকর গনা উঁচু গাছের ডালে বসে ঐ দৃশ্য দেখে স্বচরিত গান ধরেছে—'বনুষেব হাত ধবি অমেশ ভোটান্ত যায়, গনা এবার একটা 'ব্যেট্ ছাওয়া' চায়।

ঢ্যানা সমস্যা বড়ই করুণ। অর্থাভাবে বিবাহে অক্ষম যুবকই 'ঢ্যানা'। তখন কন্যাপক্ষকে ববপক্ষেব পণ দিতে হতো। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কৃষকেব মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল, কনে ব্যেচ্ছাইয়া খাওয়া। স্বাভাবিক কাবণেই অর্থহীন যুবকের ঢ্যানা হওয়া ছাড়া গত্যন্তব ছিল না। অপব পক্ষে গ্রাম্য ধনীবা অর্থবলে যে কোন বয়সেব যে কয়েকটি খুশী বিয়ে কবতো। নামেমাত্র বিবাহিত স্ত্রী কার্যত বিনামাহিনাব দাসী—'ধানেব মরশুমে ইন্দুব সাতটি বিয়ে কবে' গ্রাম্য প্রবাদ। এই সব হতভাগিনীদেব কাউকে কাউকে 'ভীত পাকানো' ব্যেট্-ছাওয়া হিসাবে বাইবেব চাকব কিষাণেব পবিচর্যায় ব্যবহার কবা হতো। সাধাবণ ভাবেই ঢ্যানাবা এই সব মধুচক্রে আকৃষ্ট হয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই পেটভাতায় কাজ কবতো। এক ন্যক্কাবজনক পবিস্থিতি।

গানটি গনাব স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনযাপনেব উগ্রবাসনার স্থূল প্রকাশভঙ্গি। ঘবে এক মুঠি ধান উঠেছে। মাত্র কয়েক মাসেব খোরাক। এব ফলেই চির বঞ্চিত আদম সন্তানদেব মনে স্বাভাবিক জীবনের সকল সুপ্তবাসনা, কামনা জেগে উঠেছে মায় সন্তানসন্ততিব শিক্ষার ব্যবস্থা পর্যন্ত।

ধানকাটা অভিযানের সময় সৈয়দপুর, লালমনির হাট প্রভৃতি স্থানের রেল ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা রাতের অন্ধকাবে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সংগ্রামী আধিয়ারদের উৎসাহ দিতেন এবং মজুর কৃষকের শ্রেণী-ঐক্যের প্রয়োজনের কথা শুনাতেন। বড়গাছা (ডোমার থানা) অঞ্চলের জঙ্গীবাহিনী লাল ঝাণ্ডা ক্ষেতে গেড়ে ধান কাটতেন আর শিয়ালদহ —শিলিগুড়ি লাইনের চলন্ত গাড়ির ইঞ্জিনের ভারতীয় খালাসীদের উদ্দেশ্যে শ্লোগান দিতেন—"দুনিয়ার মজদুর—কৃষক এক হও"। খালাসীরা ইঞ্জিনের বাঁশী মুহুর্মুহু বাজিয়ে প্রত্যুত্তর দিতেন। সাদা

চামড়ার ড্রাইভারা প্রথম দিকে বাধা দিতো, পরে উদাসীন থাকতো। মালগাড়ি ও যাত্রীগাড়ী প্রায় সময়েই থেমে যেতো ও বেসরকারীভাবে কৃষকরা নীলফামারী ও ডোমার যাতায়াত করতো। বর্তমানে সেখানে সরকারীভাবেই একটি রেলষ্টেশন হয়েছে।

ইতিমধ্যে গরীব আধিয়ারদের মধ্যে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার বোধ জেগে উঠেছে। পার্টির কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও দেখা গিয়েছে গ্রামের গরীব শিক্ষক, ধর্মযাজক বিধবা প্রভৃতিকে গোপনে ⅓এর পরিবর্তে অর্ধেক অংশই দেওয়া হয়েছে।

এই সময় তদানীন্তন মুসলিম লীগ নেতা উকীল দবীর মিঞা (বর্তমানে আওয়ামী লীগ), মরহুম খয়রাত হোসেন (যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী) ও উকিল মরহুম মনছুর মিঞার নেতৃত্বে আধিয়ার নয় আনা ভিত্তিতে একটি 'আপোস প্রস্তাব আসে। প্রাদেশিক কৃষক সমিতির নির্দেশে তা অগ্রাহ্য হয়।

আমার মনে হয় দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তির অধিকাংশ সক্রিয় সমর্থন না দিলেও তাঁরা বিরুদ্ধে যান নি। এবং এই কারণেই রংপুরের তেভাগার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হয়েছিল।

শীতের শেষঃ জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন তুঙ্গে ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগ আসন্ন। এমতাবস্থায় মেদিনীপুরে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন আহূত হয়। আমাকে এবং প্রয়াত কমরেড পাঁচুতুড়িকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জেলা কৃষক সমিতি মনোনীত করেন। সেখানে প্রায় বিনা আলোচনাতেই তেভাগা সংগ্রাম বিনাশর্তে প্রত্যাহৃত হয়।

উভয়ের মাথার উপর হুলিয়া। খুবই সাবধানে যাতায়াত করতে হয়েছিল। ফেরার পথে শান্তাহারে এক দুর্ঘটনার জন্য বগুড়ার লাইনে দু'ষ্টেশন পরিমিত পথ পায়ে হেঁটে পরে রেলযোগে দোমোহনী পৌছি। সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে তিস্তার বুনোগুয়োর ভরা চর ভেঙ্গে জলপাইগুড়ি শহর। আবার দুর্ঘটনা। সারারাত্রি পায়ে হেঁটে রাতে

ডোমার 'ডেন'-এ পৌঁছি। ভোটান হয়ে ফিরেছিলাম। নিরাপদে তবে অনাহার ও ফাল্গুনের রোদে কষ্ট হয়েছিল খুবই।

বিভাগোত্তর পূর্ব-পাকিস্তান / বাংলাদেশের কমিউনিষ্টদের অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য দায়িত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে এখানে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। সীমাহীন প্রতিকুল পরিবেশ সত্ত্বেও এই মহান শ্রেণী সংগ্রামের সঠিক মূল্যায়ণের ভিত্তিতে শিক্ষা গ্রহণে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ এর পূর্ব পর্যন্ত রংপুর জেলা পার্টি তেভাগা অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নতুন কাজ সবে শুরু হয়েছে। সরকারী মতে ভূমিহীনের সংখ্যা ৫৬% ভাগ, বাস্তব ক্ষেত্রে আরও বেশী। ক্ষেত মজদুর সমিতির কাজ বেশ দানা বেধে উঠেছে। নতুন প্রজন্ম শহীদ তন্নারায়ণ ও তেভাগার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

কিছুদিন পূর্বে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নামকরণ উপলক্ষে আহুত জনসভায় বহুনিন্দিত যাদু মিঞার (জিয়ার মন্ত্রী সভায় সিনিয়র মন্ত্রী এবং মন্ত্রী থাকাকালীন প্রায় তিন বৎসর পূর্বে মারা যায়) নামে নামকরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষ থেকে তন্নারায়নের নামের প্রস্তাব ওঠে। পরিণতি অবশ্যই স্বাভাবিক। শহীদের রক্ত বৃথা যায় না। স্থানীয় প্রচেষ্টায় শহীদস্মৃতি নির্মাণের ব্যবস্থা হচ্ছে।

তেভাগার নেতৃত্বে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী যারা দেশে ছিলেন তাদের মধ্যে এক, কমরেড বাচ্চাই শেখ বেশ কিছুদিন আগেই মারা যান। দুই, কমরেড চাটু মাস চারেক পূর্বে পার্বতিপুর রেল জংশনে আছাড় খেয়ে উরুর হাড় ভাঙ্গা অবস্থায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। স্থানীয় ও জেলা জঙ্গ। তার চিকিৎসা ও পরিচর্যার সাধ্যমত প্রচেষ্টা নেন। মরহুমের —শিলিং াল ঝাণ্ডায় ঢেকে তার বাড়ীর (ডিমলা) কবর স্থানে পার্টির উদ্দেশ্যে উপস্থিতিতে 'গার্ড-অব-অনার' সহকারে সমাহিত করা হয়। খালাসীর' : প্রতিক্রিয়া বেশ অনুকূল হয়েছে। তিন, মাস তিনেক পূর্বে

ছকৃদিভাই রোগে ভুগে মারা গিয়েছেন। চার, এই মাত্র ৮।৮ ইং লিখতে বসে কছির ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেলাম (১৯৮৪ সালের ২৮শে জুন কমরেড কছির মিঞার সাথে যোগাযোগের জন্য গ্রাম হরিপুর, ডাকঘর পূর্ননগর, জেলা রংপুর এই ঠিকানায় পত্র লেখি। উদ্দেশ্য, 'রংপুর জেলার তেভাগা আন্দোলন' সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা মাফিক একটি স্মৃতিচারণা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধের জন্য। দুঃখের বিষয়, আমার লেখা চিঠিটি তার কিছুদিন পর জুলাই মাসের ১৬ তারিখে রংপুব ডাকবিভাগ থেকে ফিরে আসে। চিঠিব ঠিকানার অংশে লেখা থাকে 'মালিক মারা গিয়াছে'। এ খবর পেয়ে সাথে সাথেই কমরেড সোনেব নিকট পত্র লেখে জানাই। সম্পাদক)। বিস্তারিত খবর এখনও আসেনি। বোধ করি বার্ধক্যজনিত মৃত্যু।

পাকিস্তানের গোড়ার দিকে কছির মিঞাকে একবার ডিমলা পাঠান হয়। জোতদারেব গুণ্ডাবা তাকে অমানুষিক প্রহার করে। উলঙ্গ করে দু'হাত প্রসারিত অবস্থায় লাঠির সঙ্গে বেঁধে চিল বানিয়ে পিছন থেকে মাবতে মারতে ১৫ মাইল দূরে নীলকামারী হাজতে পৌছে দেয়। আমৃত্যু কছিরভাই নিবেদিত প্রাণ একনিষ্ঠ পার্টি কমরেড ছিলেন।

এই সব পুরনো মোস্‌লিম কমরেডের জীবন—অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আঘাতে প্রতিঘাতে জর্জরিত। এদের আত্মত্যাগ বৃথা যায় নি—যাবে না।

পরিশেষে জানাই মহান তেভাগা সংগ্রামের বীর শহীদদের অম্লান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, প্রয়াত সহযোদ্ধাদের অমূল্য অবদানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও জীবিত সহযোদ্ধাদের প্রতি নিবিড় বিপ্লবী অভিনন্দন। মহান তেভাগার শিক্ষা অমর হউক।

মণিকৃষ্ণ সেন

তেভাগা সংগ্রামের অমর কাহিনী

উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলার (জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও রংপুর) কৃষক আধিয়ার ছিল প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় ও মুসলমান। অশিক্ষিত ও সরল প্রকৃতির ক্ষত্রিয়দের সাথে পাহাড়ী বা আদিবাসী সমাজের মিল ছিল অনেক। তারা ছিল বড় বড় জমিদার, জোতদার ও তাদের দক্ষিণ দেশী কর্মচারীদের অবাধ শোষণের শিকার। ক্ষত্রিয় সমিতির প্রভাবে এরা জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিল, যেমন ছিল লীগের প্রভাবে মুসলমানরা। উভয় সম্প্রদায়ই বর্ণহিন্দুদের অবিশ্বাস করত।

তবুও এই শতাব্দীর '৪০ এর দশকের উত্তরবঙ্গের এই তিনটি জেলা নিঃসন্দেহে কৃষকআন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্রে পরিণত হয়। রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি—এই তিনটি জেলার সংযোগস্থলে কালীর মেলায় ১৯৭০ সালের প্রারম্ভে যে গণ্ডী আন্দোলন আরম্ভ হয় তা দাবানলের মত পরিব্যাপ্ত হয় দিনাজপুর, রংপুরের নীলফামারী মহকুমা, জলপাইগুড়ির বোদাপচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানায়। লক্ষাধিক কৃষক সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। কৃষক ঐক্যের ক্ষমতা তারা ভাল করেই বুঝতে পারল। তাদের মনে জেগে উঠল শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আত্মবিশ্বাস। আধিয়ার প্রধান এই অঞ্চলে শীঘ্রই জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে আধিয়ার আন্দোলন আরম্ভ হল। কিন্তু এটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কাজেই ব্যাপক দমননীতির প্রয়োগে এ আন্দোলন সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গেল। অনেক নেতা ভারত রক্ষা আইনে আটক হলো। কিছু নেতা আত্মগোপন করে কৃষকদের অগ্রগামী জঙ্গী অংশকে সংগঠিত করতে থাকল। '৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে মারা গেল হাজার হাজার গরীব কৃষক আধিয়ার, ক্ষেতমজুর। মজুতদার, মহাজন ও জোতদারদের শোষণ আরও

মারাত্মক আকার ধারণ করলো। শ্রেণীচেতনাও বাড়ল। এরই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক হাতিয়াব। ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন কি করে রংপুরের ডিমলা থানায় তথা সমগ্র নীলফামারী মহকুমায় সাম্প্রদায়িকতাবাদের মারাত্মক অস্ত্র ভোঁতা করে দিয়েছিল, কি করে সে আন্দোলন নতুন মানুষ তৈরী করেছিল এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে একদিকে শাসক ও শোষক শ্রেণীগুলো যেমন বুঝতে পারল পুরানো কায়দায় তার শাসন শোষণ চলতে পারে না, অপরদিকে গরীব কৃষক আধিয়ারও বুঝতে পারল অবধি শোষণ বন্ধ করতে না পারলে '৪৩ সালের মত দুর্ভিক্ষ বার বার আসবে এবং তাদের কে জোতদার মহাজনদের কাছে আরও বেশী করে বাধা পড়তে হবে। তাই বড় বড় জোতদার মহাজন ও আধিয়ার প্রধান নীলফামারী মহকুমায় বিশেষ করে ডিমলা, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ থানার আধিয়াররা আওযাজ তুলল—'তেভাগা চাই', 'নিজ খামারে ধান তোল।

ডিমলা থানার স্থানীয় নেতা হরিকান্ত সরকার এ আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন। তাঁকে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন মণিকৃষ্ণ সেন, মহী বাগচী, নৃপেন ঘোষ প্রভৃতি। এক মাড়ওয়াড়ী জোতদারের গুণ্ডারা মণিকৃষ্ণ সেনকে এমন মারাত্মক ভাবে আহত করল যে তাঁকে চিকিৎসার জন্য সদরে চলে যেতে হল। গোড়াতেই ঘা খেয়ে আন্দোলন সাময়িকভাবে থমকে দাড়াল। কিন্তু কিছু কিছু সংগঠিত এলাকায় নিজ খোলানে ধান তোলার সাথে সাথে আধিয়াররা নিজেদের উদ্যোগেই সর্বত্র তেভাগা কমিটি গড়তে লাগল। মুসলমান আধিয়ার কৃষকরা সাম্প্রদায়িক জোতদারদের প্রভাবে আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিল। ক্রমশঃ তারাও জামসেদ চাটি, নয়মহম্মদ, বাচ্চামহম্মদ প্রভৃতি গরীব আধিয়ার কৃষক নেতার নেতৃত্বে আন্দোলনে জঙ্গী ভূমিকা নিল। ফলে খগাখড়িবাড়ীর মুসলমান জোতদাররা আপোসের কথাবার্তার আড়ালে সশস্ত্র আক্রমণের

জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ডিমলা থানার কেন্দ্রস্থলে খগাখড়ি বাড়ী। এটা ছিল প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান জোতদারদের আবাসস্থল। যাদুমিঞা অর্থাৎ মশিউর রহমান ছিলেন ঐসব সাম্প্রদায়িকতাবাদী জোতদারদের প্রধান নেতা। তাদের ধারণা ছিল মুসলমান আধিয়াররা কোন ক্রমেই এ আন্দোলনে যোগ দেবে না। এতদ্ভিন্ন তাদেব বাড়ীগুলিব চারপাশে বাস করত 'পরজা আধিয়াররা। তারা একান্ত-ভাবেই নির্ভরশীল ছিল জোতদারদের উপর। কারণ তাদের ভিটা বাড়ী, হাল বলদ সবকিছুরই মালিক ছিল জোতদাররা।

শেষ পর্যন্ত 'পরজারাও' সংগোপনে তেভাগার জন্য তাদেব স গঠন গড়ে তুলতে লাগল। শেষ পদক্ষেপের জন্য যখন একদিন রাত্রে ৭০।৮০ জন একত্র বৈঠক করছিল তখন যাদু মিঞার নেতৃত্বে প্রায় ২৫।৩০ জন জোতদার বন্দুকসহ উপস্থিত হয় এবং তাদের উপর গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ঘটনাস্থলে তন্নারায়ন (একজন পরজা) নিহত হয় এবং ২৫।৩০ জন আহত হয়। তৎকালীন 'স্বাধীনতার' বিশেষ স‌ংবাদদাতা এবং প্রখ্যাত লেখক ও কবি গোলাম কুদ্দুস আন্দোলনেব স বাদ সংগ্রহ করার জন্য তার পূর্বদিনই ডিমলায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকেও বাধ্য হয়ে তীব্র শীতের মধ্যে সারারাত্রি মৃত ও আহতদের পাশে কাটাতে হয়।

এই আক্রমণের ফলে আধিয়াররা ভীতসন্ত্রস্ত হ'লই না বরং প্রায় সমগ্র নীলফামারী মহকুমার আধিয়াররা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল। তারা আওয়াজ তুলল "খুনী যাদু মিঞার বিচার চাই, যাদু মিঞার রক্ত চাই"। আরম্ভ হ'ল মহকুমা শহরে এই দাবী নিয়ে অভূতপূর্ব হিন্দু-মুসলমান আধিয়ারদের দীর্ঘ জঙ্গী অভিযান। এই অভিযানে ঐ মহকুমার আধিয়ার কৃষকরাও মুকুছেদ আলী, মণ্টু মজুমদার, দীনেশ লাহিড়ী প্রভৃতির নেতৃত্বে সামিল হ'ল। হিন্দু-মুসলমান আধিয়ার কৃষকের এ অভূতপূর্ব ঐক্যে ভীত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বা তাদের মুরুব্বীদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল।

মহকুমা শহরের মাত্র দশ মাইল দক্ষিণে সৈয়দপুর রেলওয়ে শহরে অবাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ করল। ঠিক আধিয়ারদের মহকুমা শহর অভিযান আরম্ভ হওয়ার দিনই। ঐ দাঙ্গার ফলে প্রায় ২০।৩০ জন নিহত হয়। দশ সহস্রাধিক আধিয়ারের জঙ্গী অভিযান যখন নীলফামারী শহরে উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে শহরে প্রবেশ করছিল ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত মৃতদেহ-গুলিও শহরে আনা হয়। সমস্ত শহরবাসী যখন দাঙ্গার আতঙ্কে অসহায় ঠিক সেই সময়ে হিন্দু মুসলমান কৃষকের বিরাট জঙ্গী বাহিনী লাঠি হাতে শহরে প্রবেশ করে। শহরের অধিবাসীরা এদেরকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাল। শহরবাসী তাদেরকে ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে অবাঙ্গালীর বাইরে বা সৈয়দপুরের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। সাম্প্রদায়িকমূলক বিদ্বেষ আর ঘটল না।

মিছিল সদর মহকুমা হাকিমের বাড়ী ঘেরাও করল। আওয়াজ তুলল 'যাদু মিঞার বিচার চাই'। মহকুমা হাকিম ঘর থেকে বের হল না পুলিশও উপস্থিত হল না। সকলের মনে সাম্প্রদায়িক শান্তি আশ্বাস জাগিয়ে আরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে গভীর রাত্রে মিছিল নিজ নিজ এলাকায় ফিরে চলল। মুখে তাদের একই আওয়াজ।

আন্দোলনকে ভীতসন্ত্রস্ত করার বা ভিতর থেকে দ্বিধা বিভক্ত করার সমস্ত প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন সরকারী আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে লাগল। আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপা হল এক চাঞ্চল্যকর 'সংবাদ'। তাতে লেখা হল—"ডিমলা থানায় এক স্বাধীন-রাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার প্রধান হলেন হরিকান্ত সরকার। এদের বাহিনী গ্রামবাসীদের কে ধরে এনে বিচার করছে এবং সাজা দিচ্ছে। এরা এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে।......................"

আন্দোলনের এক অগ্রগামী অংশের বুঝতে বাকী রইল না যে শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর আক্রমণ আসছে।

তাবাও সে আক্রমণ প্রতিহত কবাব উপায় উদ্ভাবন কবাব জন্য যখন সবেমাত্র সংগ্রাম কমিটিগুলোব বৈঠক ডেকেছে—ঠিক সেই মুহূর্তে ৯ই মার্চ বাত্রেব অন্ধকাবেব আড়ালে বাত্রি ১০টা নাগাদ তিন শতাধিক সশস্ত্র পুলিশ সমগ্র থানাব্যাপী নয়-দশটি কেন্দ্রে হানা দেয়। কোন কোন স্থানে বৈঠকবত সমগ্র সংগ্রাম কমিটিকেই তাবা গ্রেপ্তাব কবতে সমর্থ হয়। এইভাবে তাবা সেই বাত্রেই প্রায় দুইশত সংগ্রামী নেতাকে অতর্কিতে গ্রেপ্তাব কবে। হবিকান্ত সবকাবেব বাড়ী ঘেবাও কবে তাঁকে বাড়ীতে না পেয়ে তাব বাড়ীব সতেবজনকে গ্রেপ্তাব কবে নিয়ে গেল। তাব পবদিন থেকেই চলল পুলিশেব তাণ্ডব।

বংপুবেব পার্টি ও কৃষক আন্দোলনেব ব্যাপকতা বুঝতে হলে দুটি বিষয়ে উল্লেখ প্রয়োজন। এক, ১৯৪৬ সালেব নির্বাচনে বাংলাদেশে মাত্র তিনটি আসনে কমিউনিষ্ট পার্টিব Candidate জয়ী হয়। Railway Constituency থেকে জ্যোতি বোস, দিনাজপুব থেকে রূপনাবায়ণ এবং দার্জিলিং থেকে বতনলাল ব্রাহ্মণ। বংপুবেব অন্তর্গত সৈয়দপুব বেল কেন্দ্রেব ভোটই জ্যোতিবাবুব জয় সুনিশ্চিত কবে। তাব চাইতেও উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে বংপুব জেলা constituency তে বেশী ভোট পেয়েও নিজেদের ভুল হিসাবেব জন্য অর্থাৎ দিনাজপুব মত শেষ মুহূর্তে একজন প্রার্থী বেখে অন্য প্রার্থী withdraw কবিয়ে নিশ্চিত জয় হত। সমগ্র জেলা একটি constituency ছিল এবং প্রতি ভোটাবেব তিনটি ভোট ছিল—যা সে একজন, দুজন বা তিনজনকে দিতে পাবত। আমাদেব প্রার্থীবা হবিকান্ত সবকাব (ডিমলাব) এবং নির্মল বার্মণ (গাইবান্ধা) ১৭০০০ ও ১১০০০ ভোট পায় অর্থাৎ একত্রে ২৮০০০ ভোট পায়। কিন্তু যে তিনজন Elected হয় তাব মধ্যে একজন ২৩০০০ হাব ভোট পেয়েই elected হয়। বলাবাহুল্য যে আমাদেব ভোটগুলি ব্যক্তিগত ভোট নয় পার্টির ভোট। কাজেই আমরা সমস্ত ভোটই একজনকে দেওয়াতে পারতাম। এভাবে '৪৬ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি গোটা বাংলাদেশে Seat হারায়নি। জেলা

কেন্দ্রে সময়মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত কেউ না থাকাতেই এই অবস্থা হয়।

এদিক থেকে লক্ষ্য করার বিষয় যে, '৪৬ সালের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের উপর নির্ভর করেই party তিনটি Seat-ই পেয়েছিল এবং আরও একটি Seat পেয়েও হারিয়েছিল।

অবনী বাগচী

রংপুরের কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক আন্দোলন

রংপুর জেলা এককালে ছিল উত্তরবঙ্গ যুববিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র। বিপ্লবী আন্দোলনের গোড়া থেকে এই জেলাতে অনুশীলন সমিতির বিস্তৃত কাজ ছিল। কমরেড সতীশ পাকড়াশী সে যুগে দীর্ঘকাল রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করে কাজ করছিলেন। গোপন অবস্থায় তিনি গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন। পরবর্তীযুগে যুগান্তর দল বিশেষ শক্তিশালী হয়েছিল। ঢাকার স্ত্রীসঙ্ঘ ও বি ভি দলের কিছু কাজ ছিল।

শহীদ প্রফুল্ল চাকীর বাড়ী ছিল বগুড়া। তিনি রংপুরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী চিলমারী বন্দরে ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বিখ্যাত বড়া বিভলভার অপসারণের সাথে জড়িত প্রয়াতঃ সুরেন বর্ধন ছিলেন নাগেশ্বরীগঞ্জের বিশিষ্ট অধিবাসী।

রংপুর শহরের বিখ্যাত আইনজীবী প্রয়াত সতীশ চক্রবর্তী মহাশয় শহীদ ক্ষুদিরামের মামলায় তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৯৩০ দশকে রংপুর জেলার বহু বিপ্লবী কর্মী বিনা বিচারে আবদ্ধ ছিলেন। অনেকে রাজদ্রোহমূলক বিভিন্ন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সাল থেকে বিনাবিচারে আটক বা লার রাজবন্দীগণ ক্রমশঃ মুক্ত হয়ে আসতে থাকেন এবং জেলজীবনে তাদের রাজনৈতিক বিকাশ লাভ ঘটে।

কমরেড সতীশ পাকড়াশীর পূর্বতন পলাতক জীবনের অন্যতম সাথী উলিপুরের প্রয়াতঃ যোগেন মজুমদার মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত একনিষ্ঠ থাকেন।

১৯৩৬-৩৭ সালে কমরেড পাকড়াশী বদরগঞ্জ থানায় অন্তরীণ আটক থাকেন। সে সময় সেখানকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী বিজয়

রায় এবং শচীন রায় নিজ বাড়িতে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। তারা সে সময় মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের সাথে গোপন যোগাযোগ করে মার্কসবাদের পথ গ্রহণ করেছিলেন। কমরেড সতীশ পাকড়াশী তাদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করেন। তিনি সেখানে গোপনে মার্কসবাদ পাঠচক্র সংগঠিত করেন।

কমরেড বিজয় রায় স্মৃতিচারণায় লিখেছেন যে, "বদরগঞ্জে যাতে কৃষক আন্দোলন আরম্ভ করা যায় তার জন্য প্লান প্রোগ্রাম স্থির করবার কাজে হাত দিয়েছিলাম। কারণ উত্তরবঙ্গের একটা প্রসিদ্ধ কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা (বাতাসন বান্ধব সমিতির নেতৃত্বে জমিদারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে খাজনাবন্ধ আন্দোলন—১৯২১-২৩ সাল, সম্পাদক) আমাদের ছিল। ঐ আন্দোলন করতে গিয়ে আমার কাকা প্রয়াতঃ ঠাকুর প্রসাদ রায় জমিদারের পাঠান গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।"

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ থানায় প্রয়াতঃ প্রখ্যাত মার্কসবাদী পণ্ডিত কমরেড রেবতী বর্মণ অন্তরীণ আটক ছিলেন। তিনি সেখানে কিছু কিছু কাজ করতে চেষ্টা করেন।

প্রতিটি পার্টিকর্মীকে কৃষকশ্রেণীর সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, শ্রেণীর সংগঠনের কাজ করতে হবে, এই নীতি ও সংকল্প নিয়ে সমস্ত মুক্ত-কর্মীরা জেলার গ্রাম-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।

অন্যদিকে এরাই তৎকালীন নিষ্ক্রিয় কংগ্রেস সংগঠন পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। সারা ভারত কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে গৃহীত গণ-সংযোগ কার্যক্রম এবং স্বতন্ত্র কৃষক সংগঠনের কাজ সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রায় সব কর্মীই কংগ্রেসের জেলা, মহকুমা বা স্থানীয় নেতৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কংগ্রেসের বেশিরভাগ প্রাচীন নেতা ও কর্মী কংগ্রেসের এই নবজাগরণে উৎসাহিত হন। প্রাচীন জনপ্রিয় কংগ্রেসনেতা কমরেড দীনেশ লাহিড়ী, কৃষক আন্দোলনেরও সংগঠনের অগ্রণী পথপ্রদর্শক হন। কমরেড অবনী বাগচী, শচীন ঘোষ,

মণিকৃষ্ণ সেন, শিবদাস লাহিড়ী, রথীন গাঙ্গুলী, সুরেশ রায় চৌধুরী, নৃপেন ঘোষ, অমৃত মুখার্জী, পরেশ মজুমদার, বিমল ভৌমিক বীরু চক্রবর্তী, ফণী বক্সী, লেখক স্বয়ং প্রভৃতি ছিলেন অগ্রণী পথিকৃত।

এলাকাগত সমিতি গঠন: কৃষকসভা "জমিদারী প্রথা বিনা ক্ষতিপূরণে উচ্ছেদের" ও "লাঙ্গল যার জমি তার" ধ্বনি সম্মুখে নিয়ে আন্দোলনে অগ্রসর হয়। কৃষক সভার জন্ম থেকেই কোর্ফা প্রজাদের স্থায়ী স্বত্বের দাবী, নীলাম, উচ্ছেদ, ক্রোক বন্ধ আন্দোলন, জমিদারের আবয়াব, বাজে আদায় বন্ধ, তহরী মহুরী বন্ধ আন্দোলন নিয়ে লড়াই শুরু হয়। বাজে আদায় বলতে কত বিচিত্র রকম ছিল ধারণা করা যায় না। যথা, বিবাহ ব্যায, অন্নপ্রাশন, পৈতা, বন্দুক কেনা, সাইকেল কেনা, মটরগাড়ী কেনা ইত্যাদি।

এই বাজে আদায়, আবয়াব বন্ধ আন্দোলন সর্বত্র জঙ্গীরূপ নেয়। এই সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে সদরের কালিগঞ্জ থানার কৃষক সমিতি।

টেপার জমিদারীতে অত্যাচার ছিল চরম। অনেক সময় জমিদারের হাতী দিয়ে মাঠের ফসল নষ্ট করে প্রজা শায়েস্তা করা হতো। হাতী দিয়ে চাষীর গ্রাম তচ্‌নচ্‌ করে দেওয়া হতো। প্রজাকে হাতীর পায়ের সাথে বেঁধে বিছুটি পাতা (চোত্‌রা পাতা) দিয়ে ধোলাই করা হতো।

১৯৩৮'এ খাজনা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারী করা হয়। চাষীদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি হয়। কমরেড অবনী বাগচী, দীনেশ লাহিড়ী, নৃপেন ঘোষ, পরেশ মজুমদার, মহী বাগচী, বিমল ভৌমিক প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কর্মীগণ কালিগঞ্জের গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি করে বসেন।

জেলা শহরে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ডেপুটেশনের প্রোগ্রাম করা হয়েছিল। পথ ২৫।২৬ মাইল। মিছিলের দিন; রাত বা ভোর ৩।৪টার সময় কর্মীরা বের হয়ে পড়েন। কুয়াশা-ঢাকা ভোর।

৮০০ কৃষক জমায়েত হন। তিস্তা নদী এবং তার প্রসারিত বালুচর পার হয়ে যেতে হয়। ততক্ষণে রৌদ্রে বালু উত্তপ্ত। রংপুর শহর পৌছাতে দুপুর ২।৩টা হয়। কৃষকের দাবী ডেপুটেশন সম্পর্কে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সংবাদ দেওয়া ছিল। সমবেত কৃষক সমাবেশে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বাজে আদায়, জুলুম অত্যাচার বন্ধ করবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

এই মিছিল ও ডেপুটেশনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সেই যুগে শতাধিক কৃষকের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কৃষক সমিতির ধ্বনি দিতে দিতে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে ২৫।২৬ মাইল গ্রামের পথ দিয়ে অভিযান শুধু বিস্তৃত এলাকাকে জাগরিত করে তোলে তাই নয়, সংগঠনের মধ্যেও নিয়ে আসে এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক চিন্তাও নতুন মোড় নেয়।

কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনঃ ১৯৩৭ সালের শেষভাগে আন্দামান প্রত্যাগত পার্টিনেতা প্রযাতঃ কমরেড দেবকুমার দাস প্রাদেশিক পার্টি কমিটির নিকট থেকে একটি নির্দেশমূলক চিঠি নিয়ে আসেন। তদনুসারে কমরেড অবনী বাগচী, শচীন ঘোষ, শিবদাস লাহিড়ী, বিনয় বাগচী ও সুরেশ রায়চৌধুরীকে প্রার্থী সভ্যপদ দিয়ে, একটি অস্থায়ী জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয় (অবনী বাগচীর চিঠি থেকে)। ১৯৩৮ সালে জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

কৃষক আন্দোলনের প্রসারঃ সদর মহকুমার বদরগঞ্জে প্রতি বৎসর শীতে একমাস ব্যাপী একটি বড় মেলা বসে। বহু দূর দূরান্ত থেকে এই মেলায় কৃষকেরা হালের গরু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করতে আসেন। ঐ সময়ে প্রয়াতঃ কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী রংপুরে পার্টি গঠনের কাজে আসেন। তাদের নিয়ে এই জেলায় একটি জনসভা করা হয়। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী জমিদার মহাজনদের শোষণের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে আহ্বান করেন। সভার পূর্বে লালঝাণ্ডা নিয়ে কৃষকের একটি সভাযাত্রা মেলাটি পরিক্রমা করে।

সমবেত কৃষকগণ বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ হন এবং নিজ নিজ অঞ্চলে সভা সমিতি করতে অনুরোধ করেন। সদর মহকুমার কর্মীগণ পীরগাছা, কালিগঞ্জ, হাতিবান্ধা, বদরগঞ্জ রংপুর শহরের উপকণ্ঠের গ্রামসমূহে ছড়িয়ে পরেন। তাঁরা গ্রামের কৃষকের বাড়ীতে আস্তানা খুঁজে নেন।

কমরেড্ মণিকৃষ্ণ সেনকে জেলা কংগ্রেস নেতা ও সম্পাদক হিসাবে মুখ্যতঃ কাজ করতে হয়। কৃষক আন্দোলনের সাথে সংযোগ রেখেই কাজ হয়। কমরেড শচীন ঘোষ রংপুর শহরে ছাত্র, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত আন্দোলনের দায়িত্ব সহ শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এলাকায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করেন। এই সময় আন্দামান বন্দীমুক্তি আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। রংপুরের সর্বত্র তীব্র আন্দোলন হয়। রংপুর কলেজ, কুড়িগ্রাম স্কুল থেকে ছাত্রদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। ১৪৪ ধারা অমান্য করে শোভাযাত্রা পরিচালনার অপরাধে শচীন ঘোষ সহ বহু ছাত্র যুবকর্মী গ্রেপ্তার হয়। অক্লান্তকর্মী কমরেড রথীন গাঙ্গুলী নীলফামারী মহকুমার সর্বত্র কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। আবু হোসেন সরকার জেলা কৃষক সমিতির সভাপতিও ছিলেন। পরে প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতি মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন।

কুড়িগ্রামে ক্রমশঃ সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৮ সালে মে দিবস উৎযাপনের জন্য ব্যাপক প্রচার হয়। এটি কৃষক সভা দিবস হিসাবে পালন করা হয়েছিল। এই সভার শেষে একজন বয়স্ক দাড়িয়ালা মুসলমান কৃষক এই লেখকের হাত ধরে বললেন, "আমি গদাই মিঞা, গান্ধীর ভলান্টিয়ার। ভাল নাম তমিজ উদ্দীন। বাড়ী বুড়াবুড়ি (উলিপুর)।" ১৯২১ সালে গান্ধীর আন্দোলনে যোগ দেন। তাতে তাঁর মন ভরে নাই। এতদিনে কৃষক সমিতি আর লালঝাণ্ডা তাঁর মনের কথা বলেছে। দুর্গাপুরের বর্ষীয়ান কৃষক ও পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন দীননাথ সরকার। এই সভায়, একই ধারায় এসে লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। এই সব কমরেডদের গ্রামে, বাড়ীতে কর্মীদের হয় আস্তানা হয়। সমিতি সংগঠিত হতে থাকে।

কুড়িগ্রাম মহকুমা কৃষক সমিতি গঠিত হয়। নেতৃত্বের প্রথম সারিতে প্রথম যুগে অনেক পুরাতন খিলাফতী ও কৃষকপ্রজা কর্মীরা থাকেন। এই সময় ব্রহ্মপুত্র নদে প্রবল বন্যা হয়। জেলা পার্টি, কুড়িগ্রামের পার্টি, কংগ্রেস, কৃষক প্রজা এবং কৃষক সমিতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে জমিদারী, সরকারী আদায়, তসিল, জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমিতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কমরেড হরিকান্ত সরকারের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, "রংপুর নিবাসী টেপার জমিদার সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার করতো। মাঠে প্রজা হাল বইছে, সেই অবস্থায় বরকন্দাজ, হালমাঝি ও হালবাড়ী থেকে প্রজাকে গলায় গামছা লাগিয়ে কাছাড়ীতে ধরে নিয়ে যেতো। এই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে নাওতারা টেপায় একটি জনসভা হয়। নিজেদের একতার প্রকাশ হিসাবে হাট বন্ধ করবার জন্য কৃষকসভা থেকে ঘোষণা করা হয়। জমিদার ঘোষণা করেন যে প্রজাদের হাট করতেই হবে।

পরদিন চারিদিক থেকে হাজার হাজার চাষী র‍্যালী করে হাটে উপস্থিত হয়। জমিদার ও তার লোকজন বন্দুক নিয়ে বাহির হয়ে এলে শ্লোগান দেওয়া হয়ঃ "গতর খেটে চাষ করি, জমিদারের কি ধার ধারি", "জমিদারের জুলুমবাজি চলবে না" ইত্যাদি। ভয়ে জমিদার প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচার; অন্যায় খরচ আদায় প্রভৃতি বন্ধ করবার দাবী মেনে নেন।"

আমাদের জয় দেখে জনগণ একতাবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। গ্রামে গ্রামে ভলেন্টিয়ার হ'তে আরম্ভ করে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বাঁধে। এইভাবে আস্তে আস্তে সংগঠন গড়ে ওঠে। গাইবান্ধা মহকুমার কাজ আরম্ভ হলেও প্রকৃতপক্ষে জনযুদ্ধ যুগে ব্যাপক কৃষক সমিতি গঠিত হয়।

সমিতির আইন আদালতগত কাজঃ জেলা কৃষক সমিতির একটি আইন বিভাগ ছিল। জমিদার মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে

কৃষককে আইনগত সাহায্য করা ছিল এই বিভাগের কাজ। কমরেড মণি মজুমদার ছিলেন এই বিভাগের দায়িত্বে। তিনি, বিনয় দাস বিশ্বেশ্বর লাহিড়ী প্রভৃতি কয়েকজন আইনজীবীর সাহায্যে এই কাজ চালাতেন। কমরেড মণি মজুমদার নিজে বিশিষ্ট উকিল। তৎকালীন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা শ্রদ্ধেয় জিতেন চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সাংস্কৃতিক কর্মী জগদীশ দাসগুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করতেন।

একটি ঐতিহাসিক মামলা ঃ কিশোরগঞ্জ থানার একজন গরীব কৃষকের একখণ্ড জমি একজন ধনী কৃষক দখল করে কয়েক বছর ধরে ভোগ দখল করে। ঐ গরীব চাষীটির নিকট তার মালিকানার কোন সরকারী দলিল ছিল না। ১৯২১ সালে জাতীয় আন্দোলনের সময় এখানে গণ অভ্যুত্থান হয়ে 'স্বাধীন সরকার'' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্বাধীন সরকারের আদালতের একটি দলিল তার ছিল। মামলা চালাবার ক্ষমতা তার ছিল না। সে কৃষক সমিতির সাহায্য প্রার্থনা করে। কৃষক সমিতি সাগ্রহে এগিয়ে আসে। নীলফামারী মুনসিফ, কোর্টে ঐ দলিল বে-আইনী বলে কৃষকটির বিপক্ষে রায় দেয়। তখন রংপুর জজকোর্টে আপীল করা হয়। জেলাজজ এস. কে. হালদার এঁর এজলাসে মামলা ওঠে। সমিতির উকিলগণ এই যুক্তি উত্থাপন করেন যে, উক্ত দলিল বৈধ হোক বা না হোক তা একথা প্রমাণ করে' যে জমিটি ঐ চাষীর। জজ যুক্তিটি গ্রহণ করে কৃষকটির অনুকূলে রায় দেন। এটা একটা অভাবনীয় জয় ছিল। এই মামলার মধ্য দিয়ে নতুন করে সকলে জানলেন যে রংপুরে ১৯২১ সালে ঐ এলাকায় একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রংপুরের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ উকিল শ্রীঅক্ষয় সেন এবং শ্রীজিতেন চক্রবর্তীর নিঃস্বার্থ সাহায্য এই মামলায় পাওয়া গিয়েছিল।

১৯৩৮ সালে রংপুরে জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনে বিপুল ভোটাধিক্যে পৃথক কৃষক সমিতি গড়বার অধিকারের প্রস্তাব

গৃহীত হয়। পরের দিন ঐ মণ্ডপে প্রাদেশিক কৃষক কমিটির জনাব আবুল হায়াতের সভাপতিত্বে জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। কমরেড আবদুল্লাহ রসুল, আব্দুল মমিন প্রভৃতি কমিউনিষ্ট পাটির নেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে জেলা কৃষক সমিতি গঠিত হয়। প্রাদেশিক কমিটিগুলি যখন গঠিত হচ্ছিল, তখনই অনেকগুলি আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছিল। আন্দোলনের দাবীগুলি ছিলঃ এক, জরুরী, আবওযাব, বকেয়া খাজনাব সুদ প্রভৃতিব বিলোপ। দুই, কোর্ফা প্রজাব উপর স্থায়ী স্বত্ব দান। তিন, কর্জা ধানেব সুদ শতকরা ২৫ ভাগ কবা (তখন ৪০ ভাগ সুদ প্রচলিত ছিল)। চার, তামাকের ওপর সবকারী শুল্কের বিলোপ সাধন (ঐ সময় ফজলুল হক মন্ত্রীসভা তামাকের ওপর শুল্ক ধার্য করেছিলেন। ফলে কৃষকরা দাম কম পেতেন)। পাঁচ, মহাজনের কাছ থেকে কৃষকরা যে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তারমধ্যে সেগুলো বাস্তবে শোধ করা হয়েছিল কিন্তু মহাজন দলিলে ওয়াসিল দেননি, সেগুলি মকুব করা এবং সুদেব হার কমানো। ছয়, জমিদারী প্রথার বিলোপ। সাত, লাঙ্গল যার জমি তার নীতির প্রবর্তন। আট, দশের 'হারি মাটিব' ভিত্তিতে চৌকিদারী ট্যাক্স ধাযকরণ। অর্থাৎ মৌজার জনসাধারণ জনসভায়, সকলের মতামতের ভিত্তিতে ট্যাক্স ধার্য করা।

"লাঙ্গল যার জমি তার" দাবীটি পরে ছোট কৃষকদের আপত্তির ফলে পরিত্যক্ত হয়। পরিবর্তে "চাষ করে যে জমির মালিক সে" ধ্বনি চালু হয়। কারণ, ছোট চাষীদের বক্তব্য হয় যে "লাঙ্গল যার জমি তার" নীতি ধনী মধ্যচাষীর অনুকূল। যে চাষীব নিজের হাল নেই অন্যের হাল ভাড়া করে চাষ করে, এই ধ্বনি তাদের স্বার্থের প্রতিকূল।

জেলা কৃষক সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলনঃ ১৯৩৯ সালে কালীগঞ্জ থানার চন্দনপাট গ্রামে রংপুর জেলা কৃষক সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড আব্দুল্লাহ রসুল সভাপতি ছিলেন। তাছাড়া কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ, বঙ্কিম

মুখার্জী ও নলিনী ঘোষ সম্মেলনে এসেছিলেন। জেলাব বিভিন্ন এলাকা থেকে দুই শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে ২৫ থেকে ৩০ হাজাব লোক জমায়েত হয়েছিলেন। বহু দূব দূব অঞ্চল থেকে মিছিল এসেছিল। প্রতিনিধি সম্মেলনে তৎকালীন কৃষক সমস্যা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যুগ ঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৩৯ সালে বংপুব জেলা কমিউনিষ্ট পার্টিব মূল বণধ্বনি ছিল 'যুদ্ধেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ' 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয মুক্তি যুদ্ধে পবিণত কব''। জাতীয বাজনৈতিক অচল অবস্থাব অবসান কবে, অত্যাচাব ও শোষণেব বিরুদ্ধে স্থানীয খণ্ড খণ্ড আন্দোলনেব ভিত্তিতে জাতীয বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোল। ভাবতেব কমিউনিষ্ট পার্টিব তৎকালীন বাজনৈতিক দলিলেব ভিত্তিতে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংগ্রাম গড়ে তুলবাব চেষ্টা হয।

১৯৩৯ সালে কালীগঞ্জ থানাব চন্দনপাট গ্রামেব জেলা কৃষক সম্মেলনেব দ্বিতীয অধিবেশনে উপরোক্ত নীতিব ভিত্তিতে সংগ্রামেব ডাক দেওযা হয। ভাবত বক্ষা আইন কার্যত অচল কবে দিযে সভা সমিতি গণতান্ত্রিক অধিকাব বক্ষাব জন্য, নানা কৌশল গ্রহণ কবে সংগ্রামেব পথ গ্রহণ কবা হয ও সংগ্রামেব পন্থা গ্রহণ কবা হয। কৃষক সমিতিব সাধাবণ অধিবেশনকে সমাবেশে পবিণত কবা হতে থাকে। বিশেষ কাযদায় জঙ্গী মিছিল সংগঠন কবা হয়। কর্মীবা বেশ সাফল্যেব সাথে সর্বত্র মিটিং মিছিল সংগঠিত কবাব কায়দা আযত্ত কবেন।

১৯৪০ সালে ২৬শে জানুয়াবী স্বাধীনতা দিবস ও দমননীতি বিবোধী দিবসে জেলাব প্রতি কেন্দ্রে ভাবতবক্ষা আইনেব বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসমাবেশ হয। এই উপলক্ষে হাট হবতাল, লাঙ্গল বন্ধ, পোষ্টার দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপকভাবে হয়। প্রতি জমায়েতে ৫ থেকে ১০ হাজাব মানুষ উপস্থিত থাকে। বংপুব শহবে ব্যক্তি-স্বাধীনতাব দাবীতে ক্রমাগত সভা হয়েছে। কৃষক এলাকা থেকে ১০ হাজাবেব উপর গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এই অবস্থায়

জেলা নেতাদের সবার নামে ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী সমন জারী করা হয়। এই অবস্থা আশঙ্কা করে সতর্কতা হিসাবে পূর্বেই প্রাদেশিক কমিটি জেলা নেতৃবৃন্দকে আত্মগোপন করতে নির্দেশ দেন। কমরেড অবনী বাগচী, লেখক স্বয়ং, শচীন ঘোষ, শিবদাস লাহিড়ী, রথীন গাঙ্গুলী প্রমুখ আত্মগোপন করে কাজ করেন।

সৈয়দপুর রেলকারখানা কেন্দ্র থেকে ৫ জন শ্রমিক নেতাকে বহিষ্কার করা হয়। রংপুর কারমাইকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ গাইবান্ধার কমরেড আবুল মোকসেদ ও নির্মল বর্মনকে কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। কুড়িগ্রামের ছাত্রকর্মী কমরেড জীবন দে, অনিলদেব, সুশীল সেন প্রভৃতিকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। ডিমলা ও লোহানী গ্রামে আই. বি ক্যাম্প স্থাপিত হয়। ২৫০ জন কৃষককর্মীর নামে ওয়ারেণ্ট, ভীতি প্রদর্শন, সূর্যাস্ত সূর্যোদয় অন্তরীণ আদেশ জারী করা হয়। জেলা কংগ্রেস সম্পাদক ও কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটি সদস্য কমরেড মণিকৃষ্ণ সেনের কংগ্রেস কার্যালয়ে গমন নিষিদ্ধ হয়। এই অবস্থায় জেলা পার্টি অফিস সহ ১৮টি গোপন পার্টি কেন্দ্র গড়া হয়। ছয়জন গোপন জেলাপার্টি সংগঠকসহ ১৯ জন গোপন পার্টি সংগঠক ঘুরে ঘুরে পার্টি সংগঠন ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পাক্ষিক ভিত্তিতে ১০০ পার্টি বুলেটিন এবং মাসে মাসে ইস্তাহার, যুদ্ধবিরোধী ইস্তাহার প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। নভেম্বর দিবসে ১ হাজার পোষ্টার দেওয়া হয়। উপরোক্ত গোপন নেতারা ছাড়া, যাঁরা গোপনে কাজ করেন তারা হচ্ছেন কমরেড নৃপেন ঘোষ অমৃত মুখার্জী, পরেশ মজুমদার মহী বাগচী মনীশ রায়, জীবন দে, অনিল গোবিন্দ দেব, সুশীল সেন, মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি।

এই সব নেতা ও কর্মীগণ স্থায়ীভাবে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে অবস্থান করেন। এইভাবে আন্দোলনের নতুন উচ্চতর পর্যায় শুরু হয়। কৃষককর্মীদের নিয়মিত মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস, ইণ্ডিয়া—টু-ডে, সোভিয়েট পার্টির ইতিহাস ক্লাশ চলতে

থাকে। অনেক পার্টি কর্মী পত্রিকা পড়বার আগ্রহ থেকে নতুন করে বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করেন। এদের কেউ কেউ পাঠচক্রের নেতা হয়ে উঠেন। এইভাবে গ্রাম অঞ্চলে সংগঠিত রাজনৈতিক সচেতন পার্টি কর্মী গ্রুপ গড়ে ওঠে।

হাটের তোলা বন্ধ আন্দোলন ঃ ১৯৩৯ এর শেষভাগে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হাটের তোলা বন্ধের দাবীতে ব্যাপক জঙ্গী আন্দোলন সংগঠিত হয়। প্রথম আরম্ভ হয় জলপাইগুড়ি জেলায়। সাথে সাথে তা দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় সংগঠিত হয়। ক্রমে মালদহ, ময়মনসিংহ, যশোহর, ২৪পরগণা ও অন্যান্য জেলায় প্রসারিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর রংপুর জেলায় হাটের তোলাবন্ধের দাবী নিয়ে অনেক বড় বড় ধারাবাহিক সফল সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে।

রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি জেলার সংগঠন ও আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। রংপুর জেলার ডোমারে রংপুর ও জলপাইগুড়ির নেতৃত্বের যুক্ত আলোচনার স্থান ছিল। আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল প্রচণ্ড। এই আন্দোলন একদিকে সামন্ত শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি লড়েছে, অন্যদিকে ভারত সরকারের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন হিসাবে প্রকাশ্য অভিযান করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের তৎকালীন নিষ্ক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক সমিতি একটি বিশিষ্ট সংগ্রামী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি হিসাবে সকলের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অভিনন্দিত হয়েছে।

কুড়িগ্রাম মহকুমাসহ সদরের কালীগঞ্জ থানা নিয়ে সে সময় একটি কমিউনিষ্ট পার্টির লোকাল কমিটি ছিল। এই সমগ্র এলাকার আন্দোলন পরিচালনার একটি পরিকল্পনা করে নেওয়া হয়েছিল। প্রথমে বেছে দেওয়া হয় একটি মাঝামাঝি ধরনের হাট যার চারপাশে কৃষক সংগঠন ব্যাপক ও শক্তিশালী, যেখানে কৃষক আন্দোলনের কিছু

পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, সেখান থেকে আন্দোলন চারপাশে ছড়িয়ে দেবার সুবিধা ছিল। প্রথমেই বড় বড় শক্তিশালী কায়েমীস্বার্থ ঘাঁটিগুলি আক্রমণ না করে চারপাশে আন্দোলনের ঢেউ তুলে এবং সংগঠন শক্তিশালী করে এ সমস্ত কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটির উপর আন্দোলনের বন্যা প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। ঐ সব কায়েমীস্বার্থের ঘাঁটির উপরে হাজার হাজার ভলেন্টিয়ার অভিযান করে, হাটের হাজার হাজার মানুষের সাথে এক হয়ে জমিদার, ইজারাদার পুলিসের বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। হাটের তোলাগণ্ডী বন্ধ হয়ে যায়।

তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারত রক্ষা আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। এই দৃষ্টিভঙ্গি রেখে উপস্থিত সংগ্রাম একটি স্থানীয় খণ্ড সংগ্রাম চড়ান্ত সংগ্রাম নয়, সেইভাবে আন্দোলন পরিচালনার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। এই আন্দোলনের সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে পার্টি ও গণসংগঠন শক্তিশালী করে, শোষক শ্রেণীদের অনিবার্য হিংস্র আক্রমণ যথাসাধ্য এড়িয়ে পরবর্তী পর্যায়ের সংগ্রামের প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করে রংপুর জেলা পার্টি বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিল, অভিজ্ঞতা তা প্রমাণিত হয়েছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির রংপুর জেলা কমিটি, জেলার সব কয়টি সমিতি এলাকায় এই আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং স্থানীয় পার্টি ও সেলগুলিকে এ বিষয়ে তৎপর করে। দ্রুতগতিতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই আন্দোলনের দাবী এইভাবে তোলা হয়েছিল। এক, কৃষকের গণ্ডি নেই (হাটের তোলা)। দুই, বাঁধা দোকানগুলি থেকে রসিদ দিয়ে খাজনা নিতে হবে। তিন, গরু ছাগল প্রভৃতি ক্রয়ের রসিদ বাবদ আদায় কমাতে হবে। চার, হাটের ইজারা প্রথা তুলে দিয়ে দলের কমিটির হাতে হাট পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

সারা জেলায় তালিকাভুক্ত ভলেন্টিয়ারের সংখ্যা গড়ে উঠেছিল

প্রায় দশ হাজার। তালিকার বাইরেও বহু ভলেন্টিয়ার ছিল। কয়েকটি হাটের তোলাগণ্ডি আন্দোলনের বর্ণনা দেওয়া হল।

কাঁঠালীবাড়ী হাট : এই হাটটি কুড়িগ্রাম ও লালমণিব হাট থানাব সংযোগস্থলে অবস্থিত। এটি ঘোরিয়াল ডাঙ্গা জমিদাবের সম্পত্তি ছিল। জমিদাব ছিলেন অপদার্থ ও দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই জেলাব তোলাবন্ধ আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং অন্যত্র তা প্রেরণা সৃষ্টি করে।

আশেপাশে কয়েকটি ইউনিয়নে ইতিমধ্যেই সমিতি গঠিত হয়ে গিয়েছিল। জমিদাব ইজারাদাবের জুলুমের বিরুদ্ধে চাবপাশেব কৃষকগণ আন্দোলনেব জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। জলপাইগুড়িব আন্দোলনেব সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছেছিল। স্থানীয় কর্মীদেব মধ্যে অনেকের হাটতোলা বন্ধ আন্দোলনেব পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল। লেখক স্বয়ং এখানে প্রথম সমিতি গঠন কবেন। স্থানীয় সমিতিব নেতা কমরেড হরেন্দ্র বর্মণ, নরেন্দ্র দেও, ধরণী কারজি দয়ারাম বর্মণ, নুটকুল বর্মণ প্রভৃতি ভলেন্টিয়ার বাহিনী গঠন কবে নেতৃত্ব দেন। কমরেড অনিল দেব, জীবন দে, মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কর্মীগণ পরিচালনা করেন। হাটের চারপাশেব ২।৩ মাইলের গ্রাম সমূহ থেকে প্রায় ২ শত ভলিন্টিয়ার 'জমিদারী প্রথা ধ্বংস হউক", 'লাঙ্গল যার জমি তার", 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ধ্বংস হউক', "সভা সমিতির অধিকার রক্ষা কর", 'হাটের তোলা বন্ধ কর" ও "কৃষকের গণ্ডি নাই' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে মিছিল কবে এসে হাট পরিক্রমা কবে তোলা আদায় বন্ধ করে দেয়। জমিদারের দারোয়ান, গুণ্ডা ও পুলিস জমিদারের স্বার্থ রক্ষা করতে এসে ভলেন্টিয়ারদের উপর হামলা শুরু করে। হাটের মানুষ অমনি ভলেন্টিয়ার বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে তাদের তাড়া করে। তারা এমন অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। হাটের লোকজনদের হাতে মার খেয়ে কোন মতে পালিয়ে বাঁচে। পরপর কিছু হাটে ভলেন্টিয়ার এসে কৃষকদের তোলা থেকে রেহাই পাবার এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

এই সাফল্যে চারপাশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে থেকে সমিতি ও ভলেন্টিয়ার সংগঠন তৈরী করে দেবার জন্য আবেদন আসতে থাকে। চারপাশের ছোটখাট হাটে স্থানীয় কৃষক া নিজেরাই অভি ান করে তোলা বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্র তিটি গ্রামে কর্মীগ্রুপ ও পার্টি গ্রুপ গঠন ও শিক্ষিত করে তুলবার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উলিপুর হাট ঃ এটি রংপুর জেলার বৃহত্তম হাট। সুদূর গারো পাহাড় অঞ্চল থেকে আদিবাসীরা ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে তুলো ও অন্যান্য গারো এলাকার কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে এই হাটে বিক্রি করতে আসতেন। এই হাট কাশিমবাজার মহারাজার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমগ্র বাহার বন্দ পরগণার (গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম মহকুমা)' এই মহারাজার সদর কাছারী হাটের স লগ্ন। উলিপুর পুলিস থানাও হাটের স লগ্ন। কাজেই ভারত রক্ষা আইন অমান্য করে এই হাটে সফলতার সাথে তোলাবন্ধ আন্দোলন করা বিশেষ কঠিন ও তাৎপর্যপূর্ণ কাজ ছিল।

উলিপুর থানার বিশেষভাবে বুড়াবুড়ি এলাকায় একেবারে প্রথম যুগেই সমিতি গঠিত হয়েছিল। দুর্গাপুর এলাকাতেও প্রায় একই সময়ে গঠিত হয়েছিল। প্রথমে বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মীরা থানার প্রায় সমস্ত ছোটখাটো হাটে আন্দোলন করে তোলা গণ্ডি আদায় বন্ধ করে দেয়। সর্বত্র শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয় এবং শতশত ভলেন্টিয়ার সংগঠিত হয়। পরবর্তী স্তরে সমস্ত শক্তি স গঠিত করে উলিপুর হাট অভিযান করা হয়। কমরেড মণীষ রায় অনিল গোবিন্দ দেব, রবি লাহিড়ী তনুরুদ্দীন মিঞা যোগেশ বর্মণ, পূর্ণ বর্মণ, দীনবন্ধু সরকার সুরেন রায়, শচীন বর্মণ, বিশ্বম্ভর সাহা, বিভুতি চক্রবর্তী প্রমুখ এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। উলিপুর বন্দরের ক গ্রেস কমিটির প্রধান সভাপতি ও পার্টি সমর্থক যোগেন মজুমদার সহ সকলেই আন্দোলনে সহযোগিতা করেন। পরপর কয়েক হাট জমিদার ও পুলিসের

সন্ত্রাস, লাঠিবাজী, গুণ্ডামী, গ্রেপ্তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে সহস্রাধিক সংগঠিত লালঝাণ্ডা সহিত লাঠিধারী ভলেন্টিয়ার বাহিনী হাটের হাজার হাজার কৃষক সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় হাট তোলা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। ফলে প্রতি গ্রামে অকথ্য পুলিশী অত্যাচার হয়। বহু সংখ্যক কর্মীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা হয়। কিছু গ্রেপ্তার করা হয়। উলিপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সত্যেন লাহিড়ীকেও এ সময় ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। জমিদার, পুলিস, গুণ্ডা জোটের এত আক্রমণ সত্ত্বেও কিন্তু গোপন সংগঠন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরই হয়েছিল। আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে পার্টি তার মূল লক্ষ্যে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে।

বড়বাড়ী হাট ঃ এই হাটটি লালমণির হাট থানার অন্তর্গত এবং জেলার বিরাট বিরাট হাটগুলির অন্যতম। সপ্তাহে দুদিন হাটের মধ্যে বুধবারের হাটটি প্রধান ছিল। এইদিন হাটটিকে গরুর হাট বলা হতো। বহুদূর অঞ্চল থেকে দালাল ও কৃষকরা গরু ছাগল কেনা-বেচা করতে আসতো। পাটের-কেনা বেচার হাট হিসাবে এই হাটটি একটি বিশেষ কেন্দ্র ছিল।

হাটটির মালিক ছিল ভাগ্যকুলের জমিদার এবং ইজারাদার ছিলেন একজন প্রভাবশালী লীগপন্থী মুসলিম জোতদার। এলাকাটি মুসলিম লীগের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার সাথে সাথেই কমরেড দয়াময় বর্মন ও লেখকের চেষ্টায় এখানে ধনীচাষী জানকী রায়ের বাড়ী কেন্দ্র করে কৃষক সমিতি গড়ে ওঠে। ক্রমে এটি আন্দোলনের কেন্দ্র, ভলেন্টিয়ার শিক্ষার কেন্দ্র হয়েছিল। কমরেড অনিলদেব এখানে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। হাটের চার পাশে পাঙ্গা, ঘড়িয়াল ডাঙ্গা, সিন্দুর-মতী, কুলাঘাট, মানিবাড়ী প্রভৃতি স্থান নিয়ে ৪।৫টি ইউনিয়ন সমিতি ও বিরাট সংখ্যক শক্ত ভলেন্টিয়ার বাহিনী গঠিত হয়। এই হাটে জমিদার ইজারাদারের অত্যাচার বন্ধের জন্য সকলে অধীর আগ্রহে

অপেক্ষা করছিল। অন্যদিকে ইজারাদার পুলিসের তোড়জোড় ও হুমকীর ঘাটতি ছিল না। শেষ পরিকল্পনা মত অভিযান আরম্ভ হয়। প্রথম দিন স্থানীয় ভলেন্টিয়ার বাহিনী ছাড়াও তিস্তা এলাকার ৩।৪টি ইউনিয়নের এবং লালমণির হাট ও কালিগঞ্জ এলাকার ৩টি ইউনিয়ন থেকে কয়েকটি বাহিনীও অংশ গ্রহণ করে। বড়বাড়ী এলাকার মুসলমান চাষীলীগ পাণ্ডাদের বাধা অগ্রাহ্য করে আন্দোলনে ব্যাপক ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

পুলিশ, ইজারাদার, গুণ্ডাবাহিনী প্রথমদিন মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে, হাজার হাজার লোকের দ্বারা চারিদিক থেকে ঘেরাও হয়ে হাত জোড় করে পালিয়ে যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে কৃষক সমিতির কৌশল ছিল যথাসম্ভব মারপিট না করে এদের হটিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় দিন থেকে স্থানীয় সমিতি আন্দোলন চালিয়ে যায়। হাটের তোলা গণ্ডি আদায় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। পশু ক্রয় বিক্রয়ের লেখাই বাবদ যে অর্থ জুলুম করে আদায় হতো, তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয় এবং কৃষক সমিতির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা চালু হয়। এই হাটে গণ্ডি তোলা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই ধারণা সবার নিকট অকল্পনীয় ছিল। এই সাফল্যের সংবাদ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃষক সমিতির জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের প্রভাব ব্যাপকভাবে জনগণের উপর পড়ে।

মুস্তফী হাট ঃ মাঝামাঝি স্তরের এই হাটটি তিস্তা এলাকার ৩।৪টি ইউনিয়নের কেন্দ্র। এই হাটের ইজারাদার ছিল একজন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলিম লীগ পন্থী জোতদার। মানুষকে বিপদে ফেলে শোষণ করাই তার ব্যবসা। তাই এখানকার হিন্দু মুসলমান সকলেই ছিল তার উপর বিক্ষুব্ধ। একে দমন করতে সকলেই উৎসুক ছিল। এই অবস্থায় হাটের গণ্ডি বন্ধ আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগালো। আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইজারাদার মুসলিম লীগের ফতোয়া জারী করে মুসলমান কৃষকদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে পারে নি।

কাঁঠালবাড়ী আন্দোলনের পরেই কমরেড মনোরঞ্জন গুহ এবং ইন্দু মুখার্জী এই এলাকায় ব্যাপক ও শক্তিশালী কৃষক সমিতি ও ভলেন্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলেন। কমরেড নৃপেন ঘোষ তাদের সাহায্য করেন। অনেকগুলি ছোটখাট হাটে তোলা বন্ধ করে দেবার পর মুস্তফীর হাটে অভিযান করা হয়। সহজেই এখানে তোলা বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ ভারত রক্ষা আইনে সাজানো সাক্ষীর সাহায্যে কয়েকজনের নামে থানায় এজাহার দেয়। এদের নয় মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কমরেড মনোরঞ্জন গুহ দেবেন্দ্রনাথ রায়, খোকা বর্মণ (নাবালক), মহিম বর্মণ, কমলা বর্মণ মোহন ডাক্তার, মজুম মিঞা ও আরো ২।৩ জন এদের মধ্যে অন্যতম। প্রবীণ নেতা ডাঃ কমলাকান্ত রায় ও বৃদ্ধ মৌঃ জসিমউদ্দীন মুন্সী (খিলাফতী) এই আন্দোলনে পুরোপুরি অংশ নেন। কিন্তু সমস্ত এলাকায় এরা এত বেশী জনপ্রিয় ছিলেন যে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সম্ভব হয় নাই।

লালমণির হাট : বাংলার পূর্ব অঞ্চলে তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রেল-ঘাঁটি ছিল লালমণির হাট জংশন। পাশেই ধরলা নদীর পারে শক্তিশালী কৃষক সমিতির ঘাঁটি যোগন হাট। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে এখানে ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহ ও শেষ সংগ্রাম হয়েছিল। জায়গাটি মুর্শিদাবাদ নবাব এষ্টেটের জমিদারী ছিল। এখানে কৃষক সমিতির কাজ করতেন কমরেড বিরাজ নিয়োগী। যুদ্ধকালীন দমন নীতির পরিস্থিতিতে রেলশ্রমিক নেতাদের গোপন কেন্দ্র ছিল এই এলাকায়। কমরেড নৃপেন ঘোষ ও কমরেড অমৃত মুখার্জী তৎকালীন ই বি, আর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বি. ডি আর রেল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন। তাঁরা কৃষক আন্দোলনও সংগঠিত করতেন।

ভা মন্ত্রী, ও বির জমিদার

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিস্থিতিতে, ভারতরক্ষা আইন উপেক্ষা করে লালমণির হাটে সভা করা, মিছিল করা, হাটে তোলা বন্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক কাজ বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। হাটটি ছিল ষ্টেশনের সংলগ্ন। লালমণির হাট সে সময়ে পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি

হবার পথে। কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবেই আশঙ্কা করেছিলেন যে লালমণির হাটে অচিরে কৃষক অভিযান ছড়িয়ে পড়বে। যদিও কখন, কিভাবে হবে ধারণা করতে পারেন নাই। তারা ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হন। হাটে, পথে সশস্ত্র পুলিস পাহারার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কৃষক সমাবেশ কতখানি শক্তিশালী হতে পারে সে বিষয়ে তাদের হিসাবে ভুল হয়েছিল। এখানে কৃষক সমিতির সাথে সহযোগিতা রেলশ্রমিক ইউনিয়ন করতো। স্থানীয় কংগ্রেস সভাপতি কমরেড সূর্য সেন এবং সম্পাদক কমরেড সীতাংশু সেনের নেতৃত্বে শহরের গণতান্ত্রিক শক্তিও সমবেত হয়। লালমণির হাট ও কালীগঞ্জ থানার প্রতিটি ইউনিয়নে ভলেন্টিয়ার সংগঠিত করা হয়। তাদের নিকট রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়। "ভারত রক্ষা" আইনের নাগপাশকে উপেক্ষা করে এবং ফাঁকি দিয়ে, উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করে যথাসম্ভব কম ক্ষতি স্বীকার করে, সমাবেশ ও মিছিল সফল করে, হাটের তোলা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবার শিক্ষা দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে পার্শ্ববর্তী কাঁঠালবাড়ী এলাকা, তিস্তা এলাকা, বড়বাড়ী এলাকায় প্রস্তুতি হয়। এসব জায়গাতেই প্রথম পর্বে সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তার প্রভাব পড়েছিল কৃষকদের উপর।

এভাবে লালমণির হাটের থেকে বিভিন্ন পথে কয়েক হাজার ভলেন্টিয়ার একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হয়। এখান থেকে লাঠি ও ঝাণ্ডায় সজ্জিত হয়ে মিছিল করে স্লোগান দিয়ে তারা লালমণির হাটে প্রবেশ করে। হাটে প্রবেশ করবার পর এই সংখ্যা কত হাজারে পরিণত হয় তার কোন হিসাব থাকে না। গোটা হাটের বিপুল জনসাধারণ মিছিল ও সমাবেশের অংশ হয়ে যায়। পুলিস অবরোধ ভেঙ্গে যায়। তারা কমরেড সিতাংশু সেন সহ ২।৩ জনকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু জনতা ছিনিয়ে নেয়। পুলিস জনগণের মারমুখো ভাব দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়।

পরবর্তীকালে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে "ভারতরক্ষা" আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভাদাই হাট: কালীগঞ্জ থানায় এই হাটটি অবস্থিত। এই হাটের মালিক ডিমলা এষ্টেট। এখানকার কাছারীর নায়েব স্থানীয় অধিবাসী, কিন্তু তার প্রতাপ কম ছিল না। ভাদাই হাটটি ছোট। গুরুত্বও বিশেষ ছিল না। কিন্তু এই হাটের আন্দোলনটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। স্থানীয় কৃষক প্রয়াত গোরাচাঁদ বর্মনের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে স্থানীয় কর্মীরাই এখানকার আন্দোলন পরিচালনা করেন।

দুইতিন দিন হাটে অভিযান চলার পর জমিদার পক্ষের সাথে খুব গোলমাল লাগে। জমিদারপক্ষ বাইরে থেকে লোকজন এনে জুলুম চালাতে চেষ্টা করে। তখন গোরাচাঁদ সমস্ত বিক্রেতাদের নিয়ে একটি সভা করেন। হাটের পাশেই এক কৃষকের এক অনুর্বর জমি ছিল। তিনি ঐ জমিটি হাটের জন্য ছেড়ে দেন। তখন থেকে এখানেই হাট বসতে থাকে। জনসাধারণের একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। এই কমিটির উপরেই হাট রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে। এখানেই এ আন্দোলনের বিশেষত্ব।

লোহাকুচি হাট: রংপুর জেলার হাটগুলির মধ্যে এই হাটটি খুবই প্রসিদ্ধ। জেলার একেবারে উত্তর সীমানায় অবস্থিত। এর সাথে সংলগ্ন হচ্ছে কুচবিহারের সিতাই অঞ্চল। সিতাই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তামাক উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসাবে প্রসিদ্ধ। লোহাকুচি হাটের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে তামাকের কারবার। তামাকের মরসুমে কয়েক হাজার তামাক ক্রেতা বিক্রেতা এই হাটে মিলিত হন। এই হাটের মালিকানা দু'টি জমিদারের। একটি হচ্ছে ডিমলার জমিদার, অপরটি রংপুর শহরের মজুমদার পরিবার। এই পরিবারের মণি মজুমদার ও পরেশ মজুমদারের অবদান উল্লেখযোগ্য। মজুমদার পরিবার কৃষকের দাবী প্রথম থেকেই মেনে নেন। পরেশ মজুমদার ও বিমল ভৌমিকের নেতৃত্বে এই হাটে গণ্ডি বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হয়।

উপেন সরকার ও গিরীশ সরকারেব নেতৃত্বে কমলাবাড়ী, ভাদাই ভালাবাড়ী প্রভৃতি ইউনিয়নেব ভলেন্টিয়াব বাহিনী হাট অভিযান শুরু কবে। আন্দোলন হয ডিমলা জমিদাব এষ্টেটের বিরুদ্ধে। কৃষকগণ একটি নতুন হাট প্রতিষ্ঠা করে নেয। জমিদার বাধ্য হয়ে গণ্ডিব দাবী ছেড়ে দেন। তখন কৃষকবা তামাকহাটি বাদে আব সব হাট সাবেক স্থানে নিয়ে যায। লোহাকুচি হাটেব এই আন্দোলন কুচবিহাবেব কৃষকদেব মধ্যেও বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি কবে। সীতাই অঞ্চলেব কৃষকদেব সাথে কৃষক সমিতিব যোগাযোগ ঘটে।

লালবাগ হাট ঃ এই হাটটি বংপুব শহবেব সংলগ্ন বিবাট হাট। বহুদূব অঞ্চল থেকে এখানে লোক আসতেন। এই হাটেব আশেপাশেব অপেক্ষাকৃত ছোট হাটগুলিতে গণ্ডিবন্ধ সফল হলে এই হাট অভিযান হয। প্রযাত জেলা নেতা শচীন ঘোষ, বীরু চক্রবর্তী ও ভোলা মুখার্জী নেতৃত্বে ছিলেন। এই হাটেব আন্দোলনে বংপুব শহবেব ছাত্র কর্মীবাও অংশ গ্রহণ কবেছিলেন। সাময়িকভাবে গণ্ডি আদায় বন্ধ হয়ে যায। সদবেব পাঁচটি থানাব ছোট বড় সব হাটেই আন্দোলন হয়েছে এবং সফলও হয়েছে। নীলফামাবী মহকুমাব ৬টি থানাব মধ্যে পাঁচটি থানায় ছোট বড় সব হাটেই আন্দোলন হয়েছে। তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৈসাবী হাটেব আন্দোলন।

কৈসারী হাট ঃ এখানকাব নেতৃত্বে ছিলেন বংপুবেব শান্তি সেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন যোগেশ সরকার, বইচ মিঞা, অভয় বর্মণ, আবদুল সামাদ, আবদুল আজিজ, জগালু বর্মণ প্রভৃতি। এই সময়েই কিশোরগঞ্জ থানার লোহানী অঞ্চলের কৃষক সমিতি জোতদার ধনীকৃষক, পুলিস জোটের বিরুদ্ধে একটি তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এক জোতদার একজন গরীব চাষীর জমি দখল নেবার জন্য পেয়াদা পুলিশ ও লাঠিয়াল নিয়ে জমিতে উঠে ঢোল বাজিয়ে দখল ঘোষণা করতে থাকেন।

কৃষক নেতা কমরেড যোগেশ সরকার জোতদারকে বাধা দেবার

প্রস্তাব করেন। বৈঠকে সকলে প্রস্তাব সমর্থন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক কৃষক জমায়েত হয়। তাদের হাতে লাঠি, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র ছিল। তারা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করায় পুলিস সহ জোতদারের লোকজন ঘাবড়ে যায়। কিছুক্ষণ সংঘর্ষ চলার পর ভলেন্টিয়ারগণ জোতদারের বন্দুক কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলেন। সংঘর্ষে জোতদার পক্ষের দু'জনের মৃত্যু ঘটে। জোতদার পক্ষ পালিয়ে যায়। এর পরেই আসে প্রচণ্ড দমন নীতি। ছোট বড় সকল কৃষককর্মীর বিরুদ্ধেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়। অনেকে আত্মগোপন করে। প্রচুর গ্রেপ্তার হয়। সমস্ত এলাকা জুড়ে চলে নির্মম অত্যাচার। সেখানে একটি স্থায়ী পুলিস ক্যাম্প বসে। গোয়েন্দা বিভাগের লোক মোতায়ন করা হয়, বহু সাধারণ কৃষককেও সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্যন্ত গৃহে অন্তরীণ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সেই সাথে একদিন থানায় হাজিরা দিতে বাধ্য হয়।

কুড়িগ্রাম হাট ঃ এটি মহকুমা শহরের হাট। জমিদার কাশিমবাজার রাজার এষ্টেট, তখন সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল। হাটের মধ্যেই রাজকাছারী, নিকটে থানা। এই হাট অভিযান করা হয় একেবারে সর্বশেষ পর্যায়ে। এই সময় সরকার সন্ত্রাসবাহিনী ও ভারত রক্ষা আইনের সাহায্যে আন্দোলনের টুটি চেপে ধরবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। স্থির হয় যে এবারে এই সংগ্রাম উঠিয়ে নিয়ে সংগঠনকে মজবুত ও সংহত করবার কাজে জোর দিতে হবে এবং যুদ্ধবিরোধী পরবর্তী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সরকার ও সামন্ততন্ত্রের উপর একটি জোর আঘাত হেনে সরাসরি সরকারের মোকাবিলা এড়িয়ে আন্দোলনের মোড় ঘোরাবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

এ সময়ে কংগ্রেসী নেতৃত্ব ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। অথচ, ভারত রক্ষা আইন তার দাপট চালিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতিকেই দায়িত্ব নিতে হল তার মোকাবিলা করবার। গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র কৃষক সমিতি যে সভা সমাবেশ মিছিল, সংগ্রাম পরিচালিত

করছিল, তা সকল গণতান্ত্রিক মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। জেলার সর্বত্র অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মীও এই আন্দোলনের সাথে বা তার সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন। এই অবস্থায় শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন শহরের বুকে এই সংগ্রামের পদক্ষেপের জন্য। অন্যদিকে সরকার পক্ষ শহরের এই অভিযান আশঙ্কা করে প্রতিদিন নিয়মিত বিপুল সশস্ত্র পুলিস পাহারা বসিয়ে অবস্থা মোকাবিলার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এই সময় জেলার শহর ও গ্রাম অঞ্চলের প্রায় সমস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মী ও বহু সাধারণ কর্মী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে গোপনভাবে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই অবস্থায় পুলিসের সকল প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে ও ব্যর্থ করে এ লড়াই সফল করবার কৌশল স্থির করা হয়।

নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট গোপন কর্মীরা ছিলেন কমরেড অনিল দেব, জীবন দে, সুশীল সেন, মনীষ রায়, রবি লাহিড়ী, হরেন্দ্র বর্মণ, দয়াময় বর্মন নুটকুল বর্মণ, বসন্ত চক্রবর্তী, মণি চক্রবর্তী, যোগেশ বর্মণ, পূর্ণ বর্মণ আরও অনেকে। বিশেষ বিশেষ কর্মীর নেতৃত্বে ছোট ছোট সুগঠিত দল করা হয়। বিভিন্ন দল নিয়ে এক একটি বাহিনীর নেতৃত্ব স্থির করে দেওয়া হয়। পরিচালনার দায়িত্বও নির্দিষ্ট থাকে। ছোট ছোট দলগুলি লাঠি ও ঝাণ্ডা টুপী লুকিয়ে হাটের লোকের সাথে মিশে হাটের নিকটবর্তী বিভিন্ন কেন্দ্রে জমায়েত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এই সময় হাটের মধ্যে কিছু দূর দূর সশস্ত্র পুলিস পাহারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অপেক্ষা করছিল।

নির্দিষ্ট সময় প্রধান পরিচালক বাঁশি বাজিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দলের অধিনায়কগণ তাদের বাঁশির আওয়াজ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় সমস্ত হাট লালে লাল। মাথার টুপী, হাতের লাঠি ও ঝাণ্ডা গোটা হাট ছেয়ে আছে এবং সকল স্থান থেকে একই সাথে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ ওঠে "কৃষকের গণ্ডি নাই", ওঠে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী ধ্বনি। গোটা হাটে হুলুস্থুলু আরম্ভ হয়ে যায়। হাটের হাজার হাজার মানুষ

ভলেন্টিয়ার দলের সাথে যোগ দিয়ে দাঁড়ায় এবং আওয়াজ তোলে। তাদের হাতে "বাকুয়া" (ভার বহনের ডাণ্ডা)। সমস্ত পুলিস রাইফেল নীচু করে ছুটে পালিয়ে যায়। জমিদার বাহিনী পালিয়ে যায়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজার এষ্টেট থেকে ঢোল দিয়ে ঘোষণা করা হয় যে কৃষককে কোন তোলা দিতে হবে না। যাদের বাঁধা দোকান তারা খাজনা দিয়ে রসিদ নেবেন। রেট সুনির্দিষ্ট থাকবে।

মেলায় আন্দোলন: গণ্ডিবন্ধ আন্দোলনের অসামান্য সাফল্য ঘটায় নেতা ও কর্মীগণ এত উৎসাহিত হন যে, কুড়িগ্রাম মহকুমায় দুটো বড় বড় মেলাতেও পরপর দু বৎসর এই আন্দোলন হয় এবং সাফল্য লাভ করে। মেলায় জুয়া খেলা ও পতিতালয়ের বিলোপের জন্যও কয়েকটি মেলায় আন্দোলন হয়। তা আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করেছিল। উল্লেখ্য যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধযুগে গণ্ডিবন্ধ আন্দোলন ছিল কৃষকের ব্যাপকতম শ্রেণী সংগ্রাম। সমগ্র কৃষকশ্রেণী তার স্বার্থ রক্ষায় জমিদার শ্রেণী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের চরিত্র ছিল জঙ্গী। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের শ্রেণীচেতনা ও সংগঠন বৃদ্ধি পায়। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনেক কলাকৌশল তারা আয়ত্ত করে। অনেক স্থানেই তাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়। বহু সৎ ও নির্ভীক কর্মীর আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে অনেকেরই উন্নতমানের নেতা হবার সম্ভাবনা ছিল এবং বেশ কয়েকজন হয়েও ছিলেন। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে কৃষক সংগঠন ও কমিউনিষ্ট পার্টিকে উচ্চতর স্তরে তুলে নেবার পথ এই আন্দোলন করে দেয়।

এই আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনে উপস্থাপিত রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টে বলা হয় যে, শতাধিক হাটে এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দমন নীতির আওতায় এই আন্দোলন স্বভাবতই

দমননীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলন পরিণত হয়।''

তোলাবন্ধ আন্দোলনের গোটাযুগে জেলা পার্টি সমস্ত এলাকায় আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলবার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তোলাবন্ধ আন্দোলনের পর সংঘর্ষমূলক অবস্থা থেকে সংগঠনাকে সংহত কবে, ছয় ভিত্তিক করবার রাজনৈতিক শিক্ষায় উন্নত কববার উপব জোব দেওয়া হয়। এই সময় বেআইনি বলশেভিক পার্টিব ইতিহাস ও ইণ্ডিয়া টু-ডে বই দুখানি হাতিয়ার ছিল। পার্টির সংগঠন গড়বার ও উন্নত করবার এই প্রচেষ্টাব মধ্যেই নতুন কায়দায় একটি বিশেষ দাবী সম্মুখে বেখে যুদ্ধ বিবোধী আন্দোলন শক্তিশালী করা হয়।

পাটের দরের জন্য এবং লাইসেন্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন: যুদ্ধেব বাজাবে শিল্পজাত সকল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পায়। কিন্তু কৃষকের অর্থকরী ফসলের দর বাড়লো না। খুব ভাল জাতের পাট ৬।৭ টাকা মণ দরে বিক্রী হতে থাকলো। মাঝাবী জাতের পাটের দর মণ প্রতি ৩ টাকাব বেশি উঠলো না। কৃষকের মধ্যে হতাশা ও বিক্ষোভ দুই-ই দেখা দিল। পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্ব একটি সার্কুলারে পাটের মূল্যবৃদ্ধি আন্দোলনের নির্দেশ দিলেন। মণপ্রতি ২০ টাকা দাবী করে পোষ্টার দেওয়া হয়, হাটে বাজারে প্রচার হয়, জেলা কৃষক সমিতি থেকে বিজ্ঞাপন ছড়ানো হয়। কয়েকটি হাট হরতাল হয়। একটি গণদরখাস্ত অভিযানও সংগঠিত করা হয়। দরবৃদ্ধির দিক দিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায় নাই। অন্যদিকে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার পাটের মূল্যের নিম্নগতি রোধের উদ্দেশ্যে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের একটি আইন জারী করেন। পাটের অতিরিক্ত উৎপাদন মূল্য হ্রাসের কারণ এই যুক্তির ভিত্তিতে পাটচাষ বাধ্যতা মূলকভাবে হ্রাসের ⅓ অংশ হ্রাসেব জন্য উৎপাদনে লাইসেন্স প্রথা চালু করেন। উদ্দেশ্য যাই থাক, ব্যবস্থাটি সাধারণ পাট চাষীর উপর এক চরম নির্যাতন চাপিয়ে দেয়।

এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটা একটি প্রহসনে পরিণত হয়। ধনী জোতদারদের বাড়ীতেই পাট লাইসেন্সের ক্যাম্প বসে। তাদের গায়ে বিশেষ হাত পড়ে না। মধ্যবিত্ত ও গরীব চাষীদের উপর জুলুম চলতে থাকে।

এই উপলক্ষে গরীবের পাট চাষ জমি রেকর্ডে অবিচার ঘটিয়ে ঘুষ নেবার ভাল সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। গরীবের সামান্য এক খণ্ড জমিতে পাট চাষ বাধ্যতামূলকভাবে হ্রাস বহাল করে, গরীব চাষীর পাট চাষ অর্থহীন করে দেওয়া হয়।

মাঠে মাঠে তখন পাটের চারা উঠেছে। এই সময়ে জরীপের জন্য মাঠে নামা হয় ও চারা পাট তচ্‌নচ্‌ করে দেওয়া হয়। তখন ভারত রক্ষা আইনের যুগ। সভাসমিতি করে প্রতিবাদের উপায় নাই। অনেকের বসত বাটি, বাঁশঝাড় পুকুর প্রভৃতিও পাটজমি বলে রেকর্ড করে দেওয়া হয়। ফলে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিল। কিছু অসংগঠিত হাঙ্গামা হয়। চাষীদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই অবস্থায় সর্বত্র কৃষক সমিতি ও পার্টি সজাগ হয়ে ওঠে। প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তোলাবন্ধের সময়ের মতো সরাসরি ভলেন্টিয়ার সমাবেশ ও প্রতিকারের পথ নেওয়া হয় না। প্রথম পর্যায়ে গণডেপুটেশনের পথ নেওয়া হয়। গ্রামে গ্রামে বৈঠক করে ইউনিয়ন বোর্ড, জরীপ অফিস ও বিভিন্ন স্থানে ডেপুটেশন সংগঠিত করা হয়। এইগুলি মিছিল ও সভায় পরিণত হতে থাকে। অন্যদিকে পাট লাইসেন্সের অনুকূলে সরকার পক্ষ থেকেও ইউনিয়নে ইউনিয়নে সভার ব্যবস্থা হয়। তাতে মহকুমা পর্যায়ের উচ্চতর অফিসারগণ থাকেন। কোথাও কোথাও আরও উচ্চতর পর্যায়ের অফিসার, এমনকি মন্ত্রীও থাকেন। লীগনেতারাও থাকতেন। এখানে সাধারণতঃ কৃষকদের হুমকি দেওয়া হত। কৃষকনেতা, কর্মীগণ বিশেষ দক্ষতা ও কৌশলের সাথে এই সভায় নিজেদের উদ্যোগে জমায়েত সংগঠিত করেন। সেখানে কৃষকদের অভিযোগ জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়। সরকারী পক্ষকে

পালিয়ে পিঠ বাঁচাতে হয়। জমায়েতগুলি কৃষক সভার সভায় পরিণত হয়। গোপন নেতারা জমায়েতের মধ্যেই গোপনে থাকতেন।

কৃষকেব উপর অত্যাচার, বেআইনী জুলুমের কৈফিয়ৎ দাবী করতেন, আইনের শ্রেণী চরিত্রের উপরেও আক্রমণ করতেন। সরকারী কর্মচারীগণ আজেবাজে কথা বলে, ভীতি প্রদর্শন করতেন। লোকে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের তাড়া করতো, তারা পালিয়ে যেতেন। তখন নেতাবা বক্তৃতা করতেন। প্রতিটি সভাই সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী, সামন্ত বিবোধী সভায় পরিণত হয়ে যেতো। বে-আইনী জুলুমের প্রতিরোধ ও গরীবেব পাট ভাঙ্গাব বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতো এবং গরীবেব ন্যায্য অধিকাব সংগঠন ও সমাবেশেব শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এইভাবে একেবাবে প্রায় কোন ক্ষয়ক্ষতি না দিয়ে জেলা ব্যাপী এক বিবাট সফল আন্দোলন হয়ে যায়। হাটের তোলাবন্ধের সমাবেশের তুলনায় এই আন্দোলনেব সমাবেশ অনেক বেশী সচেতন ও সংগঠিত ছিল।

প্রকাশ্য ও গোপন কাজের সমন্বয় ও সংগঠন ঃ পার্টির বে-আইনী ও গোপন যুগেব গণ-আন্দোলন ও তার সাফল্য নির্ভব করে প্রকাশ্য ও গোপন, আইনী ও বে-আইনী কাজের সমন্বয়েব উপর। এ বিষয়ে জেলা স্তর থেকে লোকাল ও সেল স্তর পর্যন্ত সচেতন প্রচেষ্টা ছিল।

সে সময় জেলা পার্টির অন্যতম নেতা কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন, জেলা কৃষক সমিতিব নেতা কমরেড দীনেশ লাহিড়ী, পার্টি উকিল কমরেড মণি মজুমদাব পার্টিনেতা কমরেড বিভূতি লাহিড়ী (ভাদু লাহিড়ী), ছাত্রনেতা কমরেড বিজলী লাহিড়ী, গোপাল সেন প্রভৃতি গোপন কাজের সাথে সু-সংহতভাবে পার্টি নেতৃত্বে প্রকাশ্য কাজ পরিচালনা করতেন। নীলফামারীতে কমরেড বিমল ভৌমিক, ক্ষিতীশ দাস, বলরাম সাহা, গোলাম আজীজ। কুড়িগ্রামের কমরেড রবি লাহিড়ী, কালা লাহিড়ী, বদরগঞ্জের কমরেড শঙ্কর রায়, বিজয় রায়, গাইবান্ধায় কমরেড নির্মল বর্মণ, পান্নু পাল, গণেশ ধর, ভুপেশ রায় ছাত্রকর্মী

কমরেড চিনু প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করতেন। লালমণির হাটে ডাঃ সূর্যকান্ত বিশ্বাস, ডাঃ সিতাংশু সেন দায়িত্বে ছিলেন।

এ সময়কার পার্টি সংগঠন, সভ্যসংখ্যা ছিল তিন শত। পার্টিকর্মী প্রায় পাঁচ শত। অসংখ্য পার্টি গ্রুপ ছিল। প্রতি পার্টি সভ্যের পরিচয় হতো গণসংগঠনের কাজ এবং পার্টির গ্রুপ গঠনের হিসাব দিয়ে।

জেলা কমিটি এ সময় লোকাল ভিত্তিক ১৫টি পার্টি ক্লাস করেন। লোকাল গতভাবে আরও অনেক হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যুগে ২০০টি পার্টি বুলেটিন বের করা হয়। মাঝে মাঝে যুদ্ধবিরোধী পোষ্টার বিলি করা হয়। নভেম্বর দিবস, মে দিবস, স্বাধীনতা দিবস (২৬শে জানুয়ারী) প্রভৃতি দিবসে ২০০০ পোষ্টার দেওয়া হয়। প্রায় আড়াই লক্ষ ইস্তাহার বিলি করা হয়। ২০০টি 'কমিনিষ্ট' ও ২০০ কপি বলশেভিক গোপনে বিক্রয় করা হতো।

এই সময়ে জেলা পার্টি কমিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিতর্ক উদ্ভব হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে, জাতীয় ঐক্য ফ্রণ্টে, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব বনাম শ্রেণীও পার্টির স্বতন্ত্র নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রাদেশিক কমিটি, জাতীয় ফ্রন্ট ও কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকার গুরুত্ব বিষয়ে একটি পার্টিপত্র প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরেই জনযুদ্ধ যুগ আরম্ভ হওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

রংপুরের তেভাগা আন্দোলন প্রসঙ্গে ঃ রংপুর জেলায় তেভাগা আন্দোলন শুধুমাত্র নীলফামারী মহকুমায় এবং সদর মহকুমার একটি গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল। নীলফামারী মহকুমার সৈয়দপুর থানা বাদ দিয়ে বাকী সব থানাতেই আন্দোলন ব্যাপ্ত হয়েছিল।

রংপুরের ভূমি ব্যবস্থা সর্বত্র একপ্রকার নয়। নীলফামারী মহকুমা বাদ দিয়ে অন্যান্য মহকুমার জোতদারেরা নিজহালে বা বর্গায় জমিচাষ করানো থেকে জমি পত্তন দেওয়া অধিকতর শ্রেয় মনে করতো। এমনকি বড় রায়ত যারা, তারাও কোর্দা প্রজা বসিয়েছিল। কোন জমিতে

দেখা গেছে কৃষক ও জমিদারের মধ্যে ৭টি স্তর আছে। সেই কারণে বেশিরভাগ কৃষকের সামান্য জমি ছিল। বড় রায়ত চাকর রেখে নিজ হালে চাষ করাতো এবং দূরের সামান্য জমি বর্গা চাষ করাতো। কুড়িগ্রাম মহকুমায় কিছুটা বিশিষ্টতা ছিল। নদীপ্রধান এই মহকুমার চর এলাকায় সর্বত্র রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা থেকে আগত মহাজন ও মারোয়াড়ী মহাজন নানা কৌশলে বিপুল জোতদারী স্বার্থ কায়েম করে বসেছে। শোষণ ছিল প্রায় আদিমস্তরে।

নীলফামারী মহকুমার ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখানে যাদের জোতদার বলা হ'তো তারা সকলেই যে প্রজাসত্ব আইন অনুযায়ী জোতসত্বের মালিক তা নয়। বেশীর ভাগ হচ্ছে বৃহৎ রায়ত। তাদের আবাদী জমির পরিমাণ বিঘা দিয়ে হয় না। হয় 'গাঁ' দিয়ে। এক গাঁ —৩২০ বিঘা। ডোমারে এক জোতদার বৎসরে নিজের ভাগে আমন ধান পেতো ২০।২৫ হাজার মণ। হাজার, দেড় হাজার বিঘা জমির মালিক বেশ কিছু ছিল। এইসব এলাকায় একদিকে আছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছোট, বড় জোতদার, অপরদিকে বিরাট সংখ্যক বর্গাদার। মধ্যকৃষক বা গরীব কৃষক খুব কম।

এইসব জোতদাব বা বৃহৎ রায়তেরা জমি যে বিধি ব্যবস্থা করে বসেছে তা মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার সমতুল্য। বর্গাদাররা ভূমিদাস ছাড়া আর কিছু নয়। এদের শতকরা ৮০ ভাগের কোন ভিটাবাড়ী নাই। জোতদাররা এদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য সামান্য কিছু জমি ও বাঁশ দেয়। তারা যতদিন জমিচাষ করবে, ততদিন সেখানে থাকতে পারবে। জোতদারের অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতে পারবে না।

বর্গাদারদের যে সব শর্ত স্বীকার করে নিতে হ'তো তা হচ্ছে এইরূপ, এক, জোতদার এক জোড়া হালের গরু দেবে। বর্গাদার প্রতিবৎসর আমন ধান দিয়ে কিস্তি শোধ করবে। দুই, জোতদার খাবার ধান কর্জ দেবে। সুদ ৫০%। যুদ্ধের সময় সুদ হ'তো দরকাটা হিসাবে। অর্থাৎ জোতদার যখন কর্জা দেবে তখন যা বাজার দর তাই হবে দেনা।

ধান উঠলে ঐ টাকায় যে ধান বাজারে পাওয়া যাবে তাই দিতে হবে। ফলে, সুদ দাঁড়ায় ২০০% শতাংশ। তিন, বেগার দিতে হবে। চার, জোতদারের প্রহরাধীনে ধান কাটতে হবে এবং তা জোতদারের গোলায় তুলতে হবে। পাঁচ, বীজ ধান সমান ভাগ হবে।

আধিয়ার ভাগচাষী যে ভাগ পাবে, তা থেকে জোতদার নিম্নোক্ত বাবদ সমূহ কেটে রাখবে, এক, হাল গরু বাবদ কিস্তি, খোরাকী বাবদ কর্জ। দুই, বিশারী অর্থাৎ বর্গাদারের প্রাপ্য অংশের ১/২০ অংশ। তিন, খামার পাইকের খরচ। চার, জোতদারের বাড়ী ধান বহনের ব্যয়। পাঁচ, জোতদারের গাড়ী, ঘোড়া, বন্দুক প্রভৃতির জন্য ধার্য্য আদায়। আউসধান, পাট, তামাক প্রভৃতি আধাআধি ভাগ হতো।

কার্যতঃ নারীপুরুষ সকলের কঠোর পরিশ্রমে যে ফসল উৎপন্ন হ'তো তার প্রায় সবটাই জোতদারের ঘরে তুলে দিতে তারা বাধ্য হত। তারপর আবার নতুন ধার কর্জ করতে বাধ্য হত। তা হতো চৈত্র মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবার মত। চৈত্র মাসে ধানের দাম বৃদ্ধি পায়। সে সময় ধান কর্জ দিলে, অনেক বেশী আদায় করা যাবে। ফলে অনেকে কর্জার হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় হিসাবে রাতারাতি পালিয়ে যেতো। একে উত্তরবঙ্গে বলা হয় 'ভুটান যাত্রা'।

নীলফামারী মহকুমা হিমালয়ের অনেকটা সংলগ্ন। তাই খুব শীতের প্রকোপ। বেশীরভাগ লোকের সকাল সন্ধ্যায় আগুনের তাপ একমাত্র ভরসা। আর নিজেদের হাতে বোনা এক রকম চট। বাসনপত্রের বিশেষ বালাই থাকতো না। শিক্ষার বালাই নাই।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় এই মহকুমার জোতদারদের গোলা ভর্তি ধান থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৫০ হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যায়। এই হিসাব অধ্যাপক প্রয়াত কামাক্ষাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সমীক্ষা করে নির্ধারিত করে যান। সরকারী হিসাব প্রায় অনুরূপ।

১৯৪০ সালে ডিমলা থানায় টেপা খড়িবাড়ী ও কিসামৎ ছাতনাই ইউনিয়নে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে প্রথম ভাগচাষী আন্দোলন হয়েছিল।

হাটের তোলা বন্ধ আন্দোলনের সাথেই প্রথম ভাগচাষী আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। জলপাইগুড়ির তৎকালীন ভাগচাষী আন্দোলনের প্রভাবও ছিল। ডিমলা থানায় ভাগ চাষীদের মধ্যে তীব্র গোলমাল ও বিক্ষোভের সংবাদ পাওয়া যায়। ঐ থানায় জোতদার পুলিসের অত্যাচার ও ভাগচাষীর প্রতিরোধ হয়েছিল তীব্রতম, মূলতঃ জোতদারের নিকট থেকে রসিদ আদায়ের দাবিতে। জোতদার কর্জার সুদ ছেড়ে দিতে রাজী কিন্তু কোন ক্রমেই রসিদ দিতে রাজী হয় নাই। রসিদ দিয়ে তারা ধানের ভাগ নিতে অস্বীকার করে। এই আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা কালাচাঁদ বর্মণকে রাতে নিদ্রিত অবস্থায় বুকে বর্শা বিদ্ধ করে জোতদাররা হত্যা করতে চেষ্টা করে। গুরুতর আহত হয়ে, দীর্ঘকাল ভুগে, অসাধারণ প্রাণশক্তির বলে তিনি বেঁচে উঠেন। জোতদাররা কেহই গ্রেপ্তার হয় না। কিন্তু শতাধিক কৃষক ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। গ্রামে গ্রামে শতাধিক পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। কৃষক কর্মীদের গৃহে আটক রাখা হয়। চাষীর ধান লুট করা হয়।

স্থান অভাবে আমি এখানে রংপুর জেলার দু'টি এলাকার তেভাগা সংগ্রামের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

কিশোরগঞ্জ থানা ও জলঢাকা থানার তেভাগা সংগ্রামঃ এই এলাকার দায়িত্ব ছিল কমরেড পরেশ মজুমদার, কমরেড আব্দুল মোকসেদের উপর। বড়ভিটা ছিল প্রধান কেন্দ্র। বিষাদু বর্মণ, বিপিন বর্মণ, বড় ধরণী, ছোট ধরণী, সৌরীন সেন প্রভৃতি এখানকার পুরোন কৃষক নেতা। কিশোরগঞ্জ থানার অধীন বড়ভিটা, মেলাবর, বড় ডমুরিয়া, রণচণ্ডি, কুটাপড়া ও কইমারী এবং জলঢাকা থানার গারগোল, ঘুঘামারা ও অন্যান্য কয়েকটা গ্রামে আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিল। কইমারির ভেরা বানিয়া, জলঢাকায় মহান্ত বানিয়া, মহিম বানিয়া, যতীন বানিয়া, আক্কাস মিঞা নেতৃত্ব দেন।

এলাকার কৃষকদের অবস্থা ডিমলা থানার কৃষকদের অবস্থার মত

চরমভাবে শ্রেণী বিভক্ত ছিল না। জোতদাররা ছিল অত্যন্ত হিংস্র ও ঘৃণ্য। বড়ভিটার বড় জোতদারের নাম কৃষকরা মুখে আনতো না। এখানে সংগ্রাম প্রথম স্তরেই জঙ্গী পর্যায়ে উঠে যায়। তারা একে একে সকল ধান কেটে আধিয়ারের ঘরে তুলেছে। সমষ্টিগতভাবে জোতদাররা প্রস্তাব দেয় তিনভাগের একভাগ নেবে, কিন্তু রসিদ দেবে না। গরীব জোতের মালিকের নিকট থেকে তেভাগা বাবদ রসিদ নিয়ে ধান দেওয়া হলো। ধনী জোতদাররা রসিদও দিল না, ধানও দেওয়া হ'ল না।

এমন সময় খবর এলো বিরাট আক্রমণ হয়েছে, গুলি চলেছে। কয়েকজন আহত। পুলিস কিছু কর্মীকে ধরে নিয়ে গেছে। জোতদার দালালদের সহায়তায় পুলিস ক্যাম্প বসে। প্রায় ১০০ জনের উপর গ্রেপ্তার হয়। চলতে থাকে পুলিসি জুলুম। দিনের বেলা কৃষকরা ক্ষেতের কাজকর্ম করে রাতের বেলা পুরুষরা দলবেঁধে বাঁশের ঝাড়ে শুয়ে থাকে, পালা করে পাহারা দেয়। বাড়ীঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয়। মেয়েদের উপর ব্যাপক অত্যাচার হয়। জোতদার পুলিস গ্রাম দখল করে রাখে। বিভিন্ন অত্যাচারে নিগৃহীত হয়েও এখানকার কৃষক পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে নাই। দেশ বিভাগের পর এখানকার মুসলমান চাষী ক্ষোভের সাথে বলেছিল, "আমাদের বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া হলো। যে জোতদারের সাথে লড়াই তারাই রাজা হয়ে বসলো।"

সদর মহকুমার বদরগঞ্জ থানার মধুপুরের তেভাগা আন্দোলন: মধুপুর রংপুর পার্টি ও কৃষকসভার একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। এলাকা ছোট। এখানকার বড় জোতদার টেল্লা বর্মণ। বর্গাদাররা সকলে ছিল হিন্দু। এর চারপাশে মুসলমান প্রধান এলাকা। এখানকার ভূমি ব্যবস্থা ডিমলার মত ছিল না। ভাগচাষীদের নিজস্ব বাড়ীঘর ও কিছু কিছু নিজস্ব জমিও ছিল। ফসল জোতদারের ঘরে তোলা হতো। হাল বর্গাদারের। নিজের ভাগ আধাআধি। সুদ, দরকাটা হিসাবে। কৃষককর্মী ও বর্গাদার মিলে আলোচনা করে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়। এই অবস্থায় জোতদার সিদ্ধান্ত করে তারা নিজেরাই ধান কেটে তুলবে। কৃষক সমিতি যদি ধান কাটতে নামে তবে মার দিয়ে তাড়াবে।

কৃষক সমিতি পরিস্থিতিগত নিজেদের দুর্বলতা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করে যে, একদিকের ধান পাহারা দেওয়া হবে। অন্যদিকের মুসলমান কৃষক ও মাতব্বরদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তাদের নিষ্ক্রিয় রাখতে হবে। সাধারণ মুসলমান কৃষক জোতদার বিরোধী ছিল, কিন্তু তারা কৃষক সমিতিব সাথে সামিল হয়ে বর্গাদারের স্বার্থে নামতে চায় না। মাতব্বররা ৯ আনা ৭ আনা ভাগের প্রস্তাব রাখেন এবং ধান কেটে জমিতে ভাগ, অথবা কোন তৃতীয় পক্ষের তত্ত্বাবধানে ধান রাখবার প্রস্তাব রাখেন। কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব মেনে নিলেও পবে বাতিল হয়ে যায়। স্থানীয় নেতারা আপোস না করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে ধান কাটবার দিন স্থির কবে ফেলেন।

ধানকাটার দিন বর্গাদার ও কৃষকগণ সমবেত হন। লাঠি প্রস্তুত বাখা হয়। ধানকাটা শুরু হতেই জোতদাররা ২৫।৩০ জন গুণ্ডা নিয়ে হামলা কবে। তাদের পক্ষে কোন হিন্দু বা মুসলমান কৃষক ছিল না। এখানকার মহিলা ক্ষেতমজুব বাহিনী গাইন, হাবুয়া, করুন প্রভৃতি নিয়ে সংগঠিতভাবে ছুটে আসে। গুণ্ডাবা ছুটে পালিয়ে যায়।

বর্গাদার ধান কেটে বাড়ী নিয়ে যায়। এই জয় স্থায়ী হতে পারে নাই। স্থির হয়েছিল যে, ধান মাড়াই করবার কাজ সাথে সাথে শেষ করে ফেলা হবে। কিন্তু বর্গাদাররা এই কাজটি উপেক্ষা করে কাটা ধান উঠানেই ফেলে রাখে। সেই রাতেই জোতদাররা বর্গাদারদের বাড়ীর উঠোন থেকে ধান চুরি করে নিয়ে যায়। সামান্য রক্ষা পায়। বর্গাদারদের পক্ষে জোতদারের বাড়ী থেকে ধান কেড়ে নিয়ে আসবার ক্ষমতা ছিল না। তারা মামলা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সে সময়ে জেলা কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে মামলা করবার মত গ্রহণযোগ্য হয় নাই।

তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে কিছু আলোচনা ঃ তেভাগা আন্দোলনের ধারা ও ফলাফলের মধ্য দিয়ে কি রাজনৈতিক সাংগঠনিক অগ্রগতি হয়েছিল এটা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলবার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তার যথার্থ সাফল্য আমরা পাই নাই। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ছিল অসচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী। যে বিপুল সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছিল তা ভবিষ্যতের জন্য যে গভীর অবদান রেখে গেছে সে বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সময়ে আমরা তাকে সংহত করবার সুযোগ পাই নাই।

আপোস ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে এলো মারাত্মক ফলাফল। ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন শ্রেণী ভিত্তিক বিভক্ত হয়ে গেলো। তখনই সব বোঝা যায় নাই। ক্রমশঃ কৃষক সভার ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্ব নেতিবাচক হয়ে উঠতে লাগলো পরিবর্তিত সরকারী নীতির সাথে সাথে, যা সামন্ত ব্যবস্থা বজায় রেখে চলে বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূলে।

এদিকে, দেশ বিভাগের সাথে সাথে হিন্দু কৃষকের মধ্যে আতংক, দোদুল্যমানতা, দেশত্যাগের ঝোঁক সৃষ্টি হতে থাকে। মুসলমান চাষীর মধ্যে কৃষকসভার সমর্থকদের মনোভাব এই উক্তি থেকে প্রকাশ পায়, "কমরেড আমাদের বাঘের মুখে ফেলা হ'লো। যার বিরুদ্ধে লড়াই করলাম তারাই এখন রাজা হয়ে বসলো। যে জোতদার তেভাগা লড়াইয়ের সময় দেশছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তারা এখন রাজা হয়ে ফিরে এলো।"

কিভাবে হঠকারী পথে গিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে সংগঠন আরো বিপর্যস্ত হবার পথে যায় সে আর এক কাহিনী।

সুধীর মুখার্জী.

আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন : ডিমলা থানা

১৯৩৯-৪০ সালে বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব একটি ভূমি রাজস্ব কমিশন বসিয়েছিলেন। সেই কমিশনের নিকট প্রাদেশিক কৃষকসভার তরফ থেকে একটি স্মারকলিপি (Memorandum) দেয়া হয়। তাতে বাংলার কৃষকদের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ যে জমিদারী প্রথা তা তুলে ধরে জমিদার—জোতদারদের সমস্ত জমি বিনা ক্ষতি পূরণে গ্রহণ করে বিনামূল্যে ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলি করার জন্য দাবি জানানো হয়। বর্গাদারদের জন্য তেভাগার দাবি সম্ভবতঃ ঐ স্মারকলিপিতে ছিল না। কিন্তু কমিশন বর্গাদারদের জন্য তাদের উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ধার্য্য করার জন্য সুপারিশ করে।

১৯৪০ সালে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন (পাঁজিয়া) থেকে প্রথম তেভাগার দাবিতে বর্গাদারদের আন্দোলন করতে আহ্বান জানানো হয়। ১৯৪১ সালে ডিমলা থানার (রংপুর) উত্তরাঞ্চলের বর্গাদারেরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে একটি বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিলেন। আর কোন জেলায় এই আন্দোলন হয়েছিল কিনা তা আমি জানি না। ডিমলার কৃষকের এই সংগ্রামের কাহিনী পরে বলা হবে। ১৯৪২ সালে ভোমার (রংপুর) সম্মেলনে 'ফ্যাসী বিরোধী জনযুদ্ধ' ও আমাদের কর্তব্যই প্রাধান্য পায়; কৃষকের শ্রেণীদাবি গৌণ হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালে নালিতাবাড়ী (ময়মনসিংহ) সম্মেলনে আবার তেভাগার দাবি তোলা হয়েছিল কিন্তু কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

ইতিমধ্যে বাংলার বুকে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল গ্রাস। বাংলার ৩৫ লক্ষ লোক (প্রধানতঃ কৃষক) প্রাণ হারান। রংপুর জেলার নীলফামারী মহকুমার ছয় লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৫০ হাজার অধিবাসীর মৃত্যু হয়। সরকার শুধু নির্বিকারই থাকলো না,

তাব অনুসৃত নীতির ফলে জোতদার, ধনী চাষী ও চোরাকারবারীরা স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে উঠলো। কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয় থাকলেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামাবী প্রতিরোধের সকল দায়িত্ব তুলে নিতে হলো কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষকসভার ঘাড়ে। মানুষকে বাঁচানোই ছিল তখন প্রধান কর্তব্য। অন্যান্য দাবিদাওয়া স্বাভাবিক কারণেই গৌণ হয়ে যায়। তবে ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধে ভারতবাসীর মদত যোগানো এবং জাতীয় সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির মিলিত মোর্চা গঠনের প্রচেষ্টায় ভাটা পড়তে দেয়া হয়নি। দুর্ভিক্ষ ও মহামাবীর ধাক্কা কাটাতে ১৯৪৪ সাল কেটে গিয়েছিল।

১৯৪৫ সালে ফ্যাসিষ্ট শক্তির চূড়ান্ত পবাজয় ঘটে এবং লাল ফৌজ সারা বিশ্বেব শ্রদ্ধা অর্জন করে। পরাধীন দেশগুলোতে মুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি দেশে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বোপবি মহাচীনেব কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজের অগ্রগতি দুর্বাব হয়ে ওঠে। এগুলোর ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের দেশে জনগণেব মধ্যে এনে দেয় মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণা। এই প্রেরণা প্রকাশ পায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ দিবস, রক্তাক্ত রসীদ আলী দিবস, মৃত্যুঞ্জয়ী নৌবিদ্রোহ ও তার সমর্থনে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের বাধা অমান্য কবে বোম্বাই-এর লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন, জব্বলপুরের দেশীয় সিপাহী এবং পাটনার পুলিস বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে।

১৯৪৬ সালে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হ'লো সারা ভারতে প্রাদেশিক আইন সভাগুলোব নির্বাচন। বাংলার প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি কয়েকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে তিনটি আসনে জয়লাভ করলো। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলার রেল মজুর কেন্দ্র থেকে কমিউনিষ্ট নেতা জ্যোতি বসুর জয়লাভ। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে এবং প্রায় প্রত্যেকটি মুসলীম আসনে জয়লাভ করে। সোহ্‌রাবর্দীর নেতৃত্বে বাংলার মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

নির্বাচনোত্তরকালে মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে রেল ও ডাক বিভাগের কর্মীদের ধর্মঘটের প্রস্তুতি এবং কয়েকটি শিল্পে ধর্মঘট কৃষকশ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে (মৌভাগ, খুলনা) তেভাগার দাবি মামুলিভাবে তোলা হয়। কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এর থেকে বোঝা যায়, প্রাদেশিক কৃষক নেতৃত্ব তখন পর্যন্ত কৃষকের সংগ্রামী মনোভাব বুঝতে অক্ষম ছিলেন।

কিন্তু বৃটিশ সরকার জনসাধারণের মনোভাব ও মেজাজ বুঝতে ভুল করেনি। তারা লীগ নেতৃত্বকে তা বুঝাতেও সক্ষম হয়েছিল। উভয়ের কলাকৌশলে ঐ সালেরই ১৬ই আগষ্ট কলকাতার বুকে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব। কয়েকদিন ধরে এই দাঙ্গা চলে এবং সেখানে থেকে বরিশাল ও নোয়াখালি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষণীয় যে, বাংলার আর কোন জেলায় দাঙ্গা হয়নি। এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে সব চাইতে গৌরবজনক ইতিহাস সৃষ্টি করেন হাসনাবাদের হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ। তাঁরা মিলিতভাবে এই সর্বনাশা দাঙ্গা প্রতিরোধ করে সারা বাংলাকে পথ দেখান।

মুসলিম লীগ নেতৃত্বের উদ্দেশ্য ছিল এই দাঙ্গাকে ব্যবহার করে একদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বকে দেশবিভাগ মানতে বাধ্য করা, অপর দিকে কৃষক-মজুরের শ্রেণী আন্দোলন ও সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়া। তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল; কিন্তু দ্বিতীয়টি হয় নি। বাংলার তেভাগা আন্দোলন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কৃষক মজুর তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন যে, হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রামই তাঁদের বাঁচার একমাত্র পথ; অপরপক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁদের ধ্বংসের পথ।

কৃষক-মজুরের এই চেতনা কৃষক সভার নেতৃত্বের গতানুগতিক চিন্তাধারায় প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং আংশিকভাবে হ'লেও তাঁদের করণীয় সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। অন্ততঃ তাঁরা এটা বোঝেন যে, কৃষকশ্রেণীকে তার দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিচালিত করা যায় এবং তা না করলে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির

শিকারে পরিণত হ'তে পারেন যা সমগ্র নিপীড়িত জনগণের পক্ষে অকল্যাণকর হবে। সামনেই ছিল ধান কাটার মরসুম। কৃষক কাউন্সিল একটি বৈঠকে তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তাব নেয় এবং বর্গাদারদের (উত্তরবঙ্গের ভাষায় আধিয়ারদের) আহ্বান জানিয়ে বলে, তোমাদের উৎপাদিত ফসল আর জোতদারের খামারে তুলবে না। উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ তোমার জন্য রেখে বাকী অংশ রসিদ নিয়ে জোতদারকে দেবে। অর্থাৎ বর্গাদারকে আবেদন নিবেদনের পথ ছেড়ে নিজের শক্তিতে তাঁর অধিকার কায়েম করতে ডাক দেওয়া হ'লো। কাজেই এটিকে 'আন্দোলন' না বলে 'সংগ্রাম' বলাই উচিত। কিন্তু যেহেতু 'তেভাগা আন্দোলন' কথাটি চালু হয়ে গেছে সেইহেতু আমিও ঐ কথাটি ব্যবহার করছি।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হলো। কিন্তু সকল দিক ভাল করে বিবেচনা করা হলো না। লক্ষ্য পৌঁছতে কী কী কৌশল গ্রহণ করতে হবে, আন্দোলনের পক্ষে এবং বিপক্ষে কী রকম শক্তি সমাবেশ হতে পারে, শত্রুপক্ষের জনসমাবেশ কতখানি সীমাবদ্ধ করা যায়, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আগুপিছু প্রয়োজন আছে কিনা—এসব কিছুই চিন্তা করা হয় নি। সংগ্রামের জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতির বিষয়টি ভাবা হয় নি। কমিউনিষ্ট নেতা বিনয় চৌধুরী বলেছেন, কৃষক কাউন্সিল যখন আন্দোলনের সিদ্ধান্ত করে, তখনও এই সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির দিকে আদৌ নজর দেওয়া হয় না। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও গঠন করা হয় না! এই ধরনের শ্রেণীসংগ্রামে শত্রুপক্ষের কাছ হ'তে কী ধরনের তীব্র আক্রমণ আসতে পারে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা আগে হ'তে ছিল না।" (বাংলার ভূমিব্যবস্থার রূপরেখা—পৃঃ ২৮) এটা সহজেই অনুমেয় যে, আন্দোলনের পর্যায় ও গতিপথ সম্বন্ধে নেতৃত্বের কোন ধারণাই ছিল না। নেতৃত্বের এক এক অংশ এক এক ভাবে বুঝেছেন। ফলে এক এক জেলায় এক এক ভাবে আন্দোলনকে বোঝানো হয়েছে এবং কর্মকৌশলও সেইভাবে ঠিক হয়েছে।

প্রাদেশিক নেতৃত্বের কেউ কেউ যে প্রথম থেকেই একটি হঠকারিতার পথ নিয়েছিলেন তাব প্রমাণও আমি পেয়েছি। কোন স্থানে এই আন্দোলনকে কৃষকেব আংশিক দাবি আদায়ের সংগ্রাম হিসাবে দেখা হয়েছে, আবার কোন স্থানে মুক্তাঞ্চল গঠনেব সূত্রপাত হিসেবে দেখা হয়েছে। তাছাড়া জেলাগুলিতে আন্দোলনের নির্দেশ এত দেরিতে পাঠানো হয়েছে যে, সকল দিক বিচাব কবে কার্যক্রম ঠিক করার সময় পাওয়া যায় নি। তবুও আন্দোলন শুরু হ'লো।

প্রথম দিকে আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চলেছে। জোতদার পক্ষ প্রথমে বুঝতেই পারেননি যে, সত্যই বর্গাদাবেরা নিজেবাই তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠা কবতে চলেছেন। কিন্তু আন্দোলন যত বাড়তে থাকলো এবং ধান কাটাব সময় যত এগিয়ে আসতে থাকলো ততই তাদের মধ্যে শঙ্কা দেখা দিতে থাকলো। তাবা প্রথমে তাদেব বক্ষীবাহিনী তৈবি করতে চেষ্টা কবলেন কিন্তু অনেক স্থানেই তা সম্ভব হ'লো না। ধানকাটা শুরু হতেই তাঁবা পুলিসেব স্মবণাপন্ন হলেন এবং পুলিসও তাদেব সাহায্যে এগিয়ে এলো, শুরু হ'লো সংঘর্ষ। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক সভা একটি পুস্তিকা প্রকাশ কবে আন্দোলনকারীদেব জন্য কতকগুলো নির্দেশ পাঠালেন। তাব সব নির্দেশগুলো এখন আমার মনে নেই। তবে তাতে ভলান্টিয়াব বাহিনী গঠন কবে সর্ব উপায়ে বর্গাদাবেব ধান ও জান রক্ষা করাব নির্দেশ ছিল। তাতে পবিষ্কাব বলা হয়েছিল যে, আত্মরক্ষাব জন্য প্রত্যেকেব সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করার অধিকাব আছে। প্রয়োজন হ'লে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রায় সব স্থানেই ভলান্টিয়াব বাহিনী গঠন কবা হয়েছিল।

অনেক স্থানে যেমন বর্গাদারেরা ধান কেটে নিজ বাড়িতে সেই ধান তুলতে থাকলেন তেমনই আবার অনেক স্থানে কৃষক কর্মীদের নামে গ্রেফতাবী পবোয়ানা বার করে এবং পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে তাদের গ্রাম ছাড়া কবে আন্দোলনকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা চললো। কোন কোন স্থানে তারা এতে সফলও হলো। অনেক স্থানে বর্গাদারেরা ধান

কাটারই সুযোগ পান নি। কোন স্থানে পুলিস বর্গাদারের কাটা ধান কেড়ে নিয়ে জোতদারকে দিয়ে দেয়। পুলিসকে বাধা দিতে গিয়ে কৃষকেরা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন।

এই আন্দোলন এত ব্যাপক ও উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল যে বাংলাব বুদ্ধিজীবী মহলে বর্গাদারদের দাবি ও সংগ্রামের কথা আলোচনাব বিষয় হয়ে উঠেছিল। কলকাতাব সংবাদপত্রগুলোতে আন্দোলন ও পুলিসী নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল। কোন কোন অকমিউনিষ্ট সংবাদপত্রেও বর্গাদারদের দাবি সমর্থন করেও পুলিসী নির্যাতনেব নিন্দা করে সম্পাদকীয় পর্যন্ত লেখা হয়েছিল। জমিতে কায়েমী স্বার্থ যাঁদেব ছিল তাঁবাও প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পাবেন নি। এর প্রভাব যেমন কৃষকদের ওপব পড়েছিল তেমনই পড়েছিল জোতদাবদের ওপরেও।

এই রকম অবস্থা যখন চলেছে তখন প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাবর্দী ঘোষণা করলেন যে, তাঁব সরকার বর্গাদারদের তেভাগাব দাবি স্বীকার করে এবং তিনি এই বিষয়ে শিগ্‌গীব একটি আইন পাস করবেন। লীগ এম এল এ.-দের বেশির ভাগই ছিলেন জোতদাব বা তাদের সমর্থক। তাদের বিরোধিতায় এই আইন পাস হ'তে পারে নি। তারপর তিনি অর্ডিন্যান্স জারী করার কথা বলেছিলেন। তাও হয়নি। তাঁর প্রতিশ্রুতি বিরাট ধাপ্পায় পরিণত হলো এবং লীগ নেতৃত্বের শ্রেণীচরিত্র জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবাব একটি ভাল সুযোগ এনে দিলো।

তেভাগা আন্দোলনে সরকারের পাশবিক দমননীতির মুখে সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে বাংলার কৃষক যেভাবে সর্বস্বপণ করে সংগ্রাম করেছেন এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা বাংলার ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকাব যোগ্য। নিহত হয়েছেন ৯০ জন, ধর্ষিতা হ'য়েছেন বহু নারী, আহত হয়েছেন কত তার হিসেব নেই। গ্রেফতারের সংখ্যা হবে কয়েক হাজার। বহুস্থানে পুলিস ক্যাম্প বসিয়ে রেখে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বহুদিন ধরে

অচল করে রাখা হয়েছিল। কৃষকরা তবুও পরাজয় স্বীকার করেননি।

তেভাগা আন্দোলন যে খুবই সময়োপযোগী হয়েছে তাতে ৬০ লক্ষ কৃষকের যোগদানের মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে। এখন এর ফলাফল নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কমিউনিষ্ট পার্টির তদানীন্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলেছিলেন কৃষকের একটি আংশিক সংগ্রামকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম হিসেবে পরিচালনা করতে গিয়ে এই সংগ্রাম বিফল হয়েছে। আমাদের জেলার অভিজ্ঞতায় আমি এই মন্তব্য সঠিক বলে মেনে নিতে পারি নি। কিন্তু বগুড়ার তদানীন্তন জেলা কমিটির সভ্য এবং এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী মিহির মুখার্জী (ভোলা মুখার্জী) আমাকে বলেছিলেন যে, বগুড়া জেলার পাঁচবিবি অঞ্চল এবং আরও দু-একটি জেলার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলতে পারেন যে, কেন্দ্রীয় কমিটির এই অভিমত সত্য। তিনি বলেছিলেন, "আমরা এই আন্দোলনকে স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম। পাঁচবিবিতে অযথা প্ররোচনা দিয়ে পুলিস ক্যাম্প বসার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। তার ফলে কৃষককর্মীরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন এবং বর্গাদারেরা ধানকাটার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। দিনাজপুরের তদানীন্তন কৃষক নেতা ডঃ সুনীল সেন তাঁর Agrarian Struggle in Bengal 1946-47 (১৯৪৬-৪৭ সালের বঙ্গের কৃষক সংগ্রাম) গ্রন্থে আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলে লিখেছেন। কিন্তু কী কারণে ব্যর্থ হ'লো তা তিনি বলতে পারেন নি।

তেভাগা আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে আমি তা স্বীকার করি না। এটা সত্য যে, তেভাগার দাবি তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এমনকি অনেক স্থানে বর্গাদারেরা তাঁদের ভাগের ধান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং আন্দোলন মাঝপথে থেমে গিয়েছে। কিন্তু এটা তো সত্য যে, ঐ আন্দোলন এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যার ফলে বুদ্ধিজীবী মহলেও আলোড়ন ওঠে এবং মন্ত্রিসভা এই দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর তিন চার বছরের মধ্যে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক

তেভাগার আইন পাস হওয়ায় ঐ আন্দোলনের সাফল্য ঘোষণা করে। পূর্ব পাকিস্তান সরকারও ঐরূপ একটি আইন পাস করেছিল বলে আমার মনে হচ্ছে।

এই আন্দোলন সফলই হোক আর বিফলই হোক, আন্দোলনে ভুল-ত্রুটি যাই থাকুক না কেন এই আন্দোলন ছিল তখন পর্যন্ত কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলার কৃষকের ব্যাপকতম ও তীব্রতম শ্রেণীসংগ্রাম। এ যেন একটি বিদ্যুতের ঝলকের মত সকলের সামনে কৃষকের প্রকৃতরূপ ও শক্তি উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে ক্ষেত মজুর থেকে মধ্য কৃষক পর্যন্ত এমনকি কোন কোন স্থলে ছোট ধনী কৃষক পর্যন্ত যে মজুর শ্রেণীর দৃঢ় মিত্র হয়ে উঠতে পারে তার সম্ভাবনাও এই আন্দোলনে প্রকাশিত হয়েছে।

এর থেকে অনেকে মনে করেন যে, কমিউনিষ্ট পার্টি তখন কৃষি বিপ্লবের ডাক না দিয়ে বিপ্লবের সম্ভাবনাব মূলে কুঠারাঘাত করেছে। যারা তেভাগা আন্দোলনেব ব্যর্থতাই শুধু দেখেন তাদের মত যেমন আমি গ্রহণ কবতে পাবিনে, তেমনই পারিনে তাদের মত গ্রহণ করতে যারা এক কদম এগিয়ে গিয়ে মনে করেন কৃষি বিপ্লবের ডাক দিলেই তা সফল হতো। যদি তাই হ'তো তবে এই আন্দোলন পরিণতি লাভ করবাব পূর্বেই থেমে গেল কেন? নৌবিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ, মজুর ধর্মঘট প্রভৃতির মধ্যে যে চেতনা কাজ করেছে তা হচ্ছে বৃটিশ বিরোধী চেতনা ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা। ১৯৪৬ সালেব নির্বাচনেব সময়ে হিন্দু মজুরদের বলতে শোনা গেছে, রুটির লড়াইএ লালঝাণ্ডা ঠিক কিন্তু আজাদির লড়াইএ তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ঠিক।

কৃষকশ্রেণীর চেতনাও ঐ স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। ডিমলার তেভাগা আন্দোলনে এর প্রমাণ আমি পেয়েছি। এই চেতনাই কি বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট? বিপ্লবের ডাক দিলেই কি বিপ্লব হয়? ১৯৪৮-৪৯ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিল; কিন্তু বিপ্লব হয় নি। সাম্প্রতিক কালে নকসালপন্থীরা কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন;

তাতেও সাড়া মেলেনি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, বিপ্লব করে জনগণ ; পার্টি অগ্রগামী সেনাবাহিনীর কাজ করে এবং নেতৃত্ব দেয়। অসংখ্য গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণ যখন বুঝতে পারে যে, একমাত্র সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনই তাদের বাঁচাব পথ করে দিতে পারে শুধু তখনই তারা বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। অবশ্য তাদের এই বোধ জাগ্রত করার কাজে পার্টির একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হ'চ্ছে বড় বড় গণ-আন্দোলনের পরিণতি ; সূচনা নয়। বিপ্লবে জনগণকে পরিচালিত করতে পারে এমন একটি পার্টি যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে সমৃদ্ধ ও সুসংগঠিত। তেভাগা আন্দোলনে বর্গাদারদের আহ্বান জানাতে যে—পার্টির এত দ্বিধা ও দৌর্বল্য ছিল, আহ্বান দিয়েও যে—পার্টি তার কবণীয় বিষয়গুলোর ওপর নজর দিতে পারে নি, সে পার্টির কৃষি বিপ্লবেব ডাক দেবার যোগ্যতাই বা ছিল কোথায় ? বিপ্লবের কোন অবস্থাই তখন ছিল না। সে সময়ে পার্টি নেতৃত্ব অনেক ভুলত্রুটি করেছেন তা ঠিক ; কিন্তু তাঁবা যে বিপ্লবী সাজতে গিয়ে কৃষি বিপ্লবের ডাক দিয়ে বসেন নি, তা ভালই করেছেন। একটি বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচিয়েছেন। তবে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (২০শে ?) বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী সাহেবের ভারতের নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা বার না হ'লে তেভাগা আন্দোলন থেকেই আরও বড় বড় আন্দোলন শুরু হয়ে একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতো কিনা তাই বা কে বলতে পারে ?

রংপুর জেলার তেভাগা আন্দোলন : রংপুর জেলার কৃষক সমিতি প্রথম থেকেই বাংলায় একটি গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে এসেছে। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে অনেক বড় বড় আন্দোলন হয়েছে। ১৯৪২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি যখন বেআইনী, বুদ্ধিজীবী সমাজ আগত সকল নেতা ও কর্মীরা যখন আত্মগোপন করে কাজ করছেন তখনও কৃষক সমিতির ২১ হাজার সভ্য সংগ্রহ করে রংপুর বাংলায় তো বটেই সম্ভবতঃ

ভারতের জেলাগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে লাল রংপুর বলে আখ্যায়িত হয়েছিল। কৃষক সমিতির এই ব্যাপক ভিত্তিই দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রতিরোধে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মিলিত রিলিফ কমিটি গঠন সম্ভব করে তুলেছিল যদিও কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্ব এইরূপ কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে ছিলেন।

এই পটভূমিতে তেভাগা আন্দোলনেও রংপুর যে বাংলায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে তাতে সন্দেহের কিছু ছিল না। বিশেষভাবে ১৯৪১ সালে যখন একটি অঞ্চলে তেভাগার আন্দোলন হয়ে গিয়েছিল। রংপুর জেলায় বর্গাপ্রথা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নিয়মে চলতো। এর মধ্যে নীলফামারী মহকুমার বর্গাপ্রথাই ছিল জঘন্যতম। ঐ এলাকার বর্গাদারেরা ভূমিদাস ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। এই এলাকাতে তেভাগা আন্দোলন শুরু করা সঠিকই হয়েছিল। ডোমার ডিমলা ও কিশোরগঞ্জ থানাতে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। এছাড়া সদরের বদরগঞ্জ থানার একটি গ্রামে এই আন্দোলন চলে। ওখানে ঐভাবে আন্দোলন করার কোন যুক্তি ছিল না। শুধু শক্তির অপব্যয় হয়েছে।

আন্দোলন শুরু করার আগে আন্দোলন সম্পর্কে কী কী আলোচনা হয়েছিল তা ঠিক বলতে পারবো না। যদিও আমি জেলা কমিটির সভ্য ছিলাম, তবুও পিতৃদায়গ্রস্ত হয়ে ছুটিতে থাকায় আমি প্রথম দিকের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারি নি। আমি শুধু সিদ্ধান্তগুলো শুনেছিলাম।

প্রাদেশিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যে সব ভুল-ত্রুটির কথা বলা হয়েছে তা রংপুর জেলা নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রস্তুতি সম্পর্কে ভালভাবে আলোচনা না হওয়ায় সব স্থানে একরকম কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয় নি। কিশোরগঞ্জে কিছুটা হঠকারিতা হওয়ায় শুরুতেই সরকারী দমননীতি ডেকে নিয়ে আসে এবং আন্দোলন পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। মিহির মুখার্জী পাঁচবিবির আন্দোলন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন এখানেও অনেকটা তাই ঘটেছিল বলে

আমি শুনেছি। ডোমারে সংগঠনের ওপর নজর দেওয়া হয়েছিল ঠিকই তবে বিস্তৃতির ওপর নজর দেওয়া হয়নি। সবচাইতে বড় কথা, তেভাগা আন্দোলনের বাইরে যে বিরাট অঞ্চল পড়েছিল সেখানকার কৃষকদের মধ্যে প্রচার করে তাঁদের এই আন্দোলনের সহযোগী করে তোলার কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। শহরের বুদ্ধিজীবীদের এই আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থক হিসেবে পাবারও কোন ব্যবস্থা হয় নি। শুধু রংপুর, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারীর উকিল লাইব্রেরীতে একদিন করে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনা চালান মণিকৃষ্ণ সেন ও সুধীর মুখার্জী। রংপুর ও কুড়িগ্রামের আলোচনার ফলাফল আমার মনে নেই। তবে নীলফামারীর কথা আমার মনে আছে। নীলফামারী শহরের বুদ্ধি-জীবীদের একটি অংশের জমিতে কায়েমী স্বার্থ ছিল। এদের মধ্যে অনেক ওকালতি করতেন। মণিকৃষ্ণ সেন যেদিন নীলফামারী উকিল লাইব্রেরীতে আলাপ করতে যান সেদিন তাঁর সাথে ডোমারের কৃষককর্মী নজম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে জেল খেটেছিলেন। আলোচনা চলাকালে একজন প্রবীণ উকিল (কংগ্রেস নেতা) নজম পণ্ডিতকে বলেন, "নজম, তুমি শেষকালে ষোল আনার আন্দোলন ছেড়ে দু'পয়সার আন্দোলনে নামলে?" নজম সাথে সাথে উত্তর দিলেন, "আমরা কৃষক, আমাদের কাছে আইন হচ্ছে ইংরাজের দেওয়া পরচা (জরিপে ভূস্বামী, স্বত্ব, জমিকর ইত্যাদি লিখিত পরিচয় পত্র)। আমরা সেই পরচা ছিঁড়ছি। আপনারা আদালতের নথিপত্র ছিঁড়ে বের হয়ে আসুন না, তবেই তো ষোল আনার আন্দোলন হয়ে যাবে।" প্রবীণ উকিল মহাশয় কোন উত্তর করতে পারলেন না। অপেক্ষাকৃত নবীনেরা নজমকে তারিফ করলেন। যাদের বিরোধিতা করবার সম্ভাবনা ছিল তাঁরাও নির্বাক থাকলেন। নজমের উত্তরটি শহরের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল।

এর থেকেই বোঝা যায় শহরের বুদ্ধিজীবীদের সহানুভূতি বা সমর্থন কোন দিকে ছিল। আমরা যদি আরো সচেতন হতাম তবে তাঁদের

সভা মিছিলে নামিয়ে তেভাগা সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করতে পারতাম। তবুও শহরে যেটুকু কাজ হয়েছে এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তেভাগা আন্দোলনের জন্য যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাব সংগ্রামী কৃষক ও জোতদার উভয়ের ওপরেই পড়েছে।

নিম্নলিখিতভাবে কাজেব দায়িত্ব নেতাদেব মধ্যে বন্টন কবা হয়েছিল। মণিকৃষ্ণ সেন ও মহীবাগচীর ওপর ডিমলা থানাব ভার পড়ে ডোমাব অঞ্চলের। দীনেশ লাহিড়ী প্রথমে ডিমলা যান। সেখানে কিছুদিন থেকে যান ডোমারে। পবেশ মজুমদাব (মণ্টু মজুমদাব) যান কিশোরগঞ্জ। তাব সাথে আর কে ছিলেন তা এখন মনে নেই। অবনী বাগচী (জেলা সম্পাদক) এবং আমাব ওপরেও ভার পড়ে ডিমলাব। তবে যেতে দিন কয়েক দেবী হয়। ডিমলা যাবাব পূর্বে আমাকে সদরেব মধুপুর অঞ্চলের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। আমাব দুর্ভাগ্য যে, আমি কোন স্থানেই প্রথম থেকে কাজ কবাব সুযোগ পাই নি। তবে ডিমলা ও মধুপুরেব প্রধান আন্দোলনের সময়ে আমি যোগদান কবেছি এবং আন্দোলনের ধাবা বুঝবারও সুযোগ পেয়েছি। আমার বর্তমান বচনায় শুধুমাত্র ডিমলাব আন্দোলনের বিষয় লিখবো। প্রসঙ্গত বলা দরকাব যে, ডঃ সুনীল সেনের উল্লিখিত পুস্তকে রংপুবের তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তাতে প্রচুর তথ্যেব ভুল আছে এবং আন্দোলনও সঠিকভাবে তুলে ধরা হয় নি।

ডিমলা থানার তেভাগা আন্দোলন : ডিমলা, ডোমার ও কিশোর-গঞ্জ থানার জোতদাবেরা সকলেই যে, প্রজাসত্ব আইন অনুযায়ী জোত-সত্বের অধিকারী ছিলেন তা নয়। এঁরা বেশিব ভাগই ছিলেন বৃহৎ রায়ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যারা 'ভয়ঙ্কর'। হাজার দেড় হাজার বিঘে জমির মালিক বেশ কিছু ছিলেন। সমগ্র অঞ্চলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরা- ...তদার ও বিরাট সংখ্যক বর্গাদারই বাস করতেন। মধ্য কৃষক বা যে ... ন সামান্য সংখ্যকই এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে বর্গাদাররা আসলে ছিলেন ভূমিদাস। তাদের নিজস্ব কোন ভিটেবাড়ী ছিল না। জোতদারের জমিতে ঘর তুলে বাস করতেন। জোতদারের অনুমতি ছাড়া তাঁরা অন্য কোথাও যেতে পারতেন না বা, অন্য কারও জমি চাষ করতে পারতেন না। আসলে তারা জমির সাথে বাঁধা ছিলেন।

জোতদার তাদের হালের গরু দিতেন এবং এই বাবদে প্রতি আমন খন্দে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ধান তাদের কাছ থেকে নিতেন। খাদ্যাভাব হলে জোতদার ধান কর্জ দিতেন। পূর্বে এই কর্জ বাবদ সুদ দিতে হতো শতকরা ৫০ ভাগ। যুদ্ধের সময় থেকে ব্যবস্থা হলো দরকাটি কর্জার। অর্থাৎ বর্গাদার যখন ধান কর্জ নিতেন তখন তার বাজার দর যা থাকতো তাই হতো কর্জ। আবার ধান ওঠার সময়ে বাজার দর অনুযায়ী ধান জোতদারকে দিতে হতো। এতে সুদ দাঁড়াত শতকরা ১০০ থেকে ১৫০ ভাগ। বর্গাদারেরা মাসে দু দিন করে জোতদারের বাড়িতে বা জমিতে বেগার খাটতে বাধ্য ছিলেন। আমন-খন্দে বর্গাদার যে ভাগ পেতেন তার থেকে কুড়ি ভাগের এক ভাগ জোতদারকে দিতে হ'তো। একে বলা হতো বিশারি। তাছাড়া আরও অনেক বাবদ ধান দিতে হতো। ফলে অনেকের ভাগ্যে মোটেই ধান থাকতো না। কারও কারও সব দিয়েও পূর্ব দেনা শোধ হতো না। আবার নতুন করে কর্জ নিতে হ'তো। এই সব আদায় আমন খন্দেই হ'তো। অন্যান্য খন্দ যেমন, আউসধান, পাট ও তামাকের আবাদে বাজে আদায় ছিল না। অবশ্য এগুলোর আবাদ ছিল খুবই কম।

তাদের খাদ্য ছিল খুবই নিম্ন মানের। হিমালয়ের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানে শীত ছিল খুবই বেশি। কিন্তু শীতবস্ত্র তাদের জুটতো না। কাঁথা সেলাই করার মত কাপড়ও জুটতো না। নিজেদের হাতে বোনা চট গায়ে দিয়ে রাত কাটাতে হ'তো।

অর্থনৈতিক দুর্দশাই সুদূর অতীতকাল থেকে তাদের ঠেলে দিয়েছে সংগ্রামের পথে। উল্লেখ্য যে, ১৯২১ সালে ডিমলা ও কিশোরগঞ্জ

থানাব কৃষকেবা বাস্তবে স্বাধীনতাই ঘোষণা কবে দিয়েছিলেন। তাব কুড়ি বছব পবে ১৯৪১ সালে আবাব এই ডিমলা থানাব কয়েকটি ইউনিযনেব বর্গাদাবেবা কৃষক সভাব আহ্বানে সাডা দিযে তেভাগা আন্দোলনে নেমেছিলেন। তখন দেশে ভাবতবক্ষা আইনে সকল প্রকাব আন্দোলন ছিল নিষিদ্ধ। বুদ্ধিজীবী কর্মীবা আত্মগোপন কবে কাজ কবছিলেন। এই অবস্থাতেও বর্গাদাবেবা জমিব ধান কেটে নিজ আঙ্গিনায তুলেছিলেন। জোতদাব পক্ষেব ক্ষমতা হয নি এঁদেব মোকাবিলা কবাব। তাদেব সাহায্য এগিযে এসেছিল ইংবাজ সবকাবেব সশস্ত্র পুলিস বাহিনী। বর্গাদাববা সে পুলিস বাহিনীকে বাধা দিতে পাবেন নি। পুলিস ও জোতদাব মিলিতভাবে বর্গাদাবদেব ধান লুঠ কবেছে জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুবে দিয়েছে। নাবী ও পুরুষ যাকেই পেযেছে তাদেব ওপবেই কবেছে অত্যাচাব। শিশুবাও বাদ পড়ে নি। তখনকাব মত সংগ্রাম দমিত হযেছিল কিন্তু বর্গাদাববা দমিত হয নি। তাবা আবাব নতুন সুযোগেব অপেক্ষায থাকলো।

এই আন্দোলনেব প্রধান নেতা ছিলেন কালাচাঁদ বর্মণ ও দীনদযাল বর্মণ। দু জনেই বর্গাদাব। জোতদাববা এঁদেব হত্যাব উদ্দেশ্যে গুণ্ডা নিযোগ কবেছিলেন। দীনদযালকে তাবা পায নি কিন্তু এক বাতে কালাচাঁদকে ঘুমন্ত অবস্থায পেযে তাঁব বুকে বল্লম বসিযে দেয। কালাচাঁদের চিৎকাবে লোকজন ছুটে আসবাব পূর্বেই গুণ্ডাবা পালিয়ে যায। কালাচাঁদ প্রাণে বেঁচে যান এবং দমিত না হযে আবাব আন্দোলনে নামেন।

তাবপব অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। দুর্ভিক্ষ-মহামাবী বহুলোকেব প্রাণনাশ কবেছে। কৃষক সমিতিকে লড়তে হয়েছে তাব বিরুদ্ধে। নিত্যপ্রযোজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে পাবার আন্দোলনও করতে হয়েছে। ১৯৪৬ সালেব মার্চ মাসে আইন সভার যে নির্বাচন হ'লো তাতে ডিমলা থানাব গয়াবাড়ী ইউনিয়নের পার্টি কর্মী হবিকান্ত সবকাব একজন প্রার্থী ছিলেন। তাঁব সমর্থনে যে সব সভা হয় সেগুলোতে

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও জমির পুনর্বণ্টনের দাবি জোরালোভাবে তোলা হয়েছিল। অল্প ভোটের ব্যবধানে হরিকান্ত হেরে যান; কিন্তু পরবর্তী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে। স্বভাবতই নির্বাচনের মাস ছয়েক পরে যখন তেভাগা আন্দোলনেব আহ্বান এল তাতে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। শুধু বর্গাদাব নয় মধ্যকৃষক যাদেব তেভাগা বা জমির পুনর্বণ্টনে কোনই লাভ-লোকসান ছিল না তাবাও এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এই আন্দোলনে স্থানীয় নেতাদের শীর্ষে ছিলেন যিনি (হরিকান্ত সরকার) তিনি ছিলেন মাঝাবী জোতদাব। তেভাগাই হোক আব জমি পুনর্বণ্টনই হোক উভয় ক্ষেত্রেই আথিক ক্ষতি ছাড়া তাঁব লাভ ছিল না। আব এই আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন যিনি (তন্নারায়ণ রায়) তিনি ছিলেন একজন মধ্যকৃষক ও কবিরাজ।

আন্দোলন শুরু : পরিকল্পনা অনুযায়ী মণিকৃষ্ণ সেন, দীনেশ লাহিড়ী ও মহী বাগচী ডিমলা গিয়ে প্রচুব জনসভা করেন। সভায় বিপুল জনসমাগম হ'তে থাকে। বিভিন্ন স্থান থেকে সভা কববাব জন্য ডাক আসতে থাকে। জোতদাবরা প্রথম দিকে এর ওপব বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু বর্গাদাব থেকে আবম্ভ কবে মধ্য কৃষক এমনকি হরিকান্তব মত জোতদাবও যখন জোট বেঁধেছেন এবং ধান কাটার সময়ও এগিয়ে এসেছে তখনই তাদের টনক নড়লো। তারা ঠিকই বুঝে নিলেন যে এই আন্দোলন চলতে দিলে তা তাদের মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের ঘন ঘন বৈঠক বসতে থাকলো—আন্দোলন প্রতিবোধ করার পন্থা উদ্ভাবনের জন্য। কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পাবছিলেন না। প্রথম চললো বর্গাদারদের উপর হুমকি আর তাদের জমি চাষ করতে দেওয়া হবে না বলে। তারপর চললো গ্রেফতারের ভীতি প্রদর্শন। কিন্তু কোন ফল হ'লো না। আন্দোলন এগিয়ে চললো। তারা স্থানীয় নেতাদের ওপর হামলা করতে সাহস পান নি। তখন ঠিক করলেন বহিরাগত নেতাদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের তাড়ানো। জলপাইগুড়িতে বসবাসকারী এক মাড়ওয়ারীর বহু জমি ছিল ডিমলায়।

তিনি আর কালক্ষেপ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি স্বয়ং একদিন মণিকৃষ্ণ সেন ও কিশোরগঞ্জ থেকে আগত বিপিন বর্মণকে নিরস্ত্র ও সঙ্গীহীন অবস্থায় পেয়ে আহত করেন। তাদের হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। শত্রুপক্ষ এবং তার কার্যাবলী সম্পর্কে আমাদের চেতনার অভাব কতখানি ছিল তা এই ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। আমরা যাদের আঘাত করতে প্রস্তুত হচ্ছি তারা আমাদের ওপর সুযোগ পেলে আঘাত হানবেন না—তা আমরা ধরে নিলাম কী করে। একটু প্রস্তুত থাকলে সেই মাড়ওয়ারীটিকেই হাসপাতালে পাঠানো যেত।

জোতদারদের হিসেবেও বিরাট ভুল হয়েছিল। আন্দোলন চলতে দিলে যে, তাদের শিয়রে সমন, সে হিসেব তাদের ঠিকই ছিল; কিন্তু বহিরাগত নেতাদের ওপর আক্রমণ চালাতে গেলেও যে সেই শমন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আরও দ্রুত এগিয়ে আসবে তা তারা বুঝতে পারেন নি। হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকা থেকে লাঠি, দাঁ, কুড়ুল প্রভৃতি নিয়ে তিন চারশত কর্মী ও সাধারণ মানুষ সেখানে জমায়েৎ হয়েছিলেন। তারা মাড়ওয়ারীটিকে খুঁজেছেন কিন্তু ততক্ষণে তিনি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ হাওয়া। জনতা তার খামার বাড়ি পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা তাদের করতে না দিয়ে তাদের নিয়ে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি দমননীতি বিরোধী ধ্বনি দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমণ করে। এই সিদ্ধান্ত ঠিকই হয়েছিল। তেভাগা কায়েম করাই আমাদের লক্ষ্য ছিল; সংগ্রামের জন্যই সংগ্রাম নয়।

এই সংবাদ জেলা শহরে পৌঁছুলে জেলা পার্টি সম্পাদক অবনী বাগচী আমাকে অন্য অঞ্চল থেকে নিয়ে আসেন এবং দুজনে ডিমলা চলে যাই। অবনী বাগচী ডিমলা থানার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেণ।

'স্বাধীনতা' পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে কবি গোলাম কুদ্দুস এবং ছবি এঁকে পাঠাবার জন্য শিল্পী সোমনাথ হোড় ডিমলায় ছিলেন।

সাধারণ লোক সময় পেলেই এসে তাঁর ছবি আঁকা দেখতেন। সমিতির কেন্দ্রিয় অফিসে সব সময়েই জনসমাগম থাকতো। আমরা যাবার পরে তাদের যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। পার্টির একজন নেতা আহত হওয়ায় দুজন নেতা এসেছেন, এতে তাঁরা খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁদের দেখে আমরাও উৎসাহিত হয়েছিলাম।

জোতদারের হামলার প্রতিবাদে তিন চারদিন পরে টিএক জনসভা হয়। সভার উদ্দেশ্যে ডোমার, সৈয়দপুর, লালমণিব হাট, গাইবাঁধা প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক নেতাই এসেছিলেন। সভাব দু-তিন দিন আগে সংবাদপত্রে প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাবর্দীর তেভাগাদাবির ন্যায্যতা স্বীকার এবং সেই অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়নের ইচ্ছার সংবাদ প্রকাশিত হয়। কৃষকরা বিশ্বাস করেছিলেন যে একটি আইন পাস হতে চলেছে। জোতদাররাও তাই বিশ্বাস কবেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ধারণা ছিল, ঠিক তেভাগা হবে না, নয় আনা সাত আনা ভাগেব আইন হতে পাবে। অচিরেই তারা বুঝে গেলেন ওবকম কোন আইন হচ্ছে না। ঐ আইন হবে তা আমবাও বিশ্বাস করিনি কাবণ লীগ এম. এল. এ.-দের প্রধান অংশই ছিলেন জোতদাব। আমবা তা কৃষকের সামনে তুলেও ধরিনি। তবে আমরা তাদের বলেছি যে, আইন হলেও একটি মরণপণ সংগ্রাম ছাড়া তা কার্যকরী হবে না।

দমননীতি বিরোধী সভাটিতে কম করেও ছয়-সাত হাজার জনসমাগম হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন ডোমাবের কমিউনিষ্ট নেতা বলরাম সাহা। প্রধান বক্তব্য রাখেন সুধীর মুখার্জী। রেল মজুর নেতা (সৈয়দপুর) কমনীয় দাসগুপ্ত তেভাগা আন্দোলনে রেল মজুরদের সমর্থন ও সংহতি ঘোষণা করেন। সভার পূর্বে জনৈক জোতদারের চাকরের কাছ থেকে জানা যায় যে, তার আগের রাতে জোতদাররা ঠিক করেছেন জুম্মাঘরে শুয়োরের মাথা ও দেবস্থানে গোরুর মাথা রেখে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা সৃষ্টি করা হবে। আমি সেই সংবাদ সভায় প্রকাশ করে ঘোষণা করি যে, কোন ধর্মস্থানে শূয়োর বা গরুর মাথা

পাওয়া গেলে হিন্দু কৃষক হিন্দু জোতদারের মাথা ফাটাবে এবং মুসলমান কৃষক ফাটাবে মুসলমান জোতদারের। জনতা এই ঘোষণা সমর্থন করেন। সভায় বলরাম সাহা ঘোষণা করেন যে, তিনি তাঁর বর্গাদারদের তেভাগার দাবি স্বীকার করে নিয়েছেন। হরিকান্ত সরকারও ঘোষণা করলেন যে, তিনি এবং তাঁর বড় ভাইও এই দাবি মেনে নিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি সব বর্গাদারকে নিজেদের সঙ্ঘ শক্তির জোরে এই দাবি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহ্বান জানান। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সভার কাজ শেষ হয়। সভার আগে বেশ কয়েকটি মিছিল এসেছিল।

সভার সাফল্য যেমন কৃষকদের উদ্দীপিত করেছিল তেমনই জোতদারদের অন্তরে এনে দিয়েছিল দারুণভীতি। একে একে সব চাল তাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে। পুলিস ছাড়া তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু আর কেউ ছিল না। কাজেই তারা পুলিসের স্মরণাপন্ন হলেন। তাদের দাবি অনুযায়ী সভার পরদিনই পুলিস ইনস্পেক্টর, দারোগা ও দুজন রাইফেল-ধারী পুলিস যাদুমিঞাদের বাড়িতে এলেন। সেই বাড়ির একটি চাকর তাদের কথাবার্তায় বুঝতে পারেন যে তারা হরিকান্ত সরকারকে ধরতে এসেছেন এবং সাথে সাথে ছুটে গিয়ে সতীশ বর্মণ নামক একজন কর্মীকে সেকথা জানান। সতীশ বর্মণ তৎক্ষণাৎ অন্যান্য স্থানে খবর পাঠিয়ে ছয়জন কর্মীকে নিয়ে কেন্দ্রিয় অফিসে আসেন। তাদের সকলেরই হাতে ছিল লাঠি। তাঁরা সংবাদটি দিয়েই দাবি করলেন, পুলিসের সাথে যে দুটো রাইফেল ও দুটো রিভলবার আছে তা তাদের কেড়ে নিতে দিতে হবে। তাদের বলা হয়েছিল ধান এবং জান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া পূর্বদিন তারা কৃষকের একতা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পেয়েছেন। কাজেই তাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে, তারা পুলিসের অস্ত্র কেড়ে নিতে সক্ষম। আমরা যে কয়জন ছিলাম তারা খবর পেয়েই হরিকান্ত সরকারকে সরিয়ে দি এবং কর্মীদের দাবি সম্পর্কে কী করণীয় তা নিয়ে আলোচনা করি। সিদ্ধান্ত

খুবই দ্রুত নিতে হয়েছিল। কারণ হস্তক্ষেপ করবার আগেই পুলিস এসে গেলে আমাদের কিছু করার থাকবে না। সবদিক বিবেচনা করে ঠিক হয় আন্দোলনের ঐ অবস্থায় এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে বিরাট পুলিস বাহিনীর দমননীতির সম্মুখীন হতে হয় এবং বর্গাদারের ধানকাটাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। আবার কর্মীদের মধ্যে যে জঙ্গী মনোভাব দেখা দিয়েছে তা দমিয়ে দেওয়াও ঠিক হবে না। কাজেই সিদ্ধান্ত হ'লো কর্মীদের সব বুঝিয়ে পুলিসের সাথে সংঘর্ষে না গিয়ে একটি দমন নীতি বিরোধী মিছিল বের করা হবে। এই কাজটি করার দায়িত্ব আমার ওপরেই পড়লো। কাজটি যে বেশ জটিল ও কঠিন ছিল তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

আমি ও লালমণির হাটের বেল মজুর নেতা বিনয় ভৌমিক কর্মীদের সব কথা বুঝিয়ে বললাম। তারা সুশৃঙ্খল বাহিনীর মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হ'লো তারা তেভাগা চায় কিনা। উত্তরে তারা বললো, তেভাগার জন্যই রাইফেল চাই। তখন তাদের বোঝানো হ'লো বন্দুক কাজে লাগে তখনই যখন আমাদের সজ্ঞশক্তি সেই পর্যায়ে নিতে পারবো। সেই কাজটি এখন করা হ'চ্ছে। ইতিমধ্যে তাদের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। সকলেরই দাবি রাইফেল দিতে হবে। তাদের বোঝানো হ'লো দক্ষিণাঞ্চলের বর্গাদারেরা এখনও ভালভাবে সংগঠিত হয় নি। এখন যদি এক বড় পুলিসী হামলা আসে তবে তারা পিছিয়ে যেতে পারে এবং এতে তোমাদের লাভ হবে না লাভ হবে জোতদারের। দুটো বন্দুক নিয়ে কি তোমরা সেই অবস্থা আনতে চাও? এটা তারা বোঝে। তাদের বলি, চল আমরা সারা এলাকা পরিক্রমণ করে জোতদারদের সাবধান করে দি। ইতিমধ্যে সুধীর মুখার্জীও কিছুক্ষণের জন্য এসে কর্মীদের বুঝিয়ে যান।

আমরা মিছিল নিয়ে পুলিস ও জোতদারের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে দিতে রওনা হয়েছি এমন সময়ে পুলিস দলটি সামনে এসে পড়েছে। অবস্থা দেখে যে পুলিসরা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তা বেশ বোঝা গেছে। তাদের

দেখে কর্মীদের লাইন ভাঙ্গবার অবস্থা। সংগ্রামের ময়দানে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নেতার নির্দেশ মান্য করা যে উচিত তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের লাইনে রাখা হ'লো। তারা পুলিস বিরোধী ধ্বনি দিতে থাকলেন।

পুলিস দলটির কাছে গিয়ে আমি তাদের আসার হেতু জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা উত্তরে বললেন যে, একটি গোলযোগের সংবাদ পেয়ে তাঁরা এসেছেন। আমি তাঁদের বললাম, এদিকে কোন গোলযোগ নেই, কিন্তু তাঁরা থাকলে গোলযোগ হতে পারে। এটা তাঁরা পূর্বেই বুঝেছিলেন কিন্তু আত্মসম্মানের খাতিরে চলে যেতেও পারছিলেন না। তখন বিনয় ভৌমিক তাদের কাছে গিয়ে বলেন যে, এখন চলে গেলে মানটা যাবে ঠিকই, কিন্তু প্রাণটা বাঁচবে, দেরী করলে দুটোই যেতে পারে। এই কথা বলার পরেই তারা সাইকেলে উঠে থানার পথ ধরলেন। এবার আমার অবাক হবার পালা। পুলিস দল পিছু ফিরতেই তাঁরা লাইন ভেঙ্গে পুলিসের পিছে ধাওয়া করলেন। আমি ও বিনয় তাদের সাথে ছুটতে থাকলাম। এবার তাদের ফেরাবার জন্য নয়; তাদের সাথে থাকার জন্য।

কিছু দূরেই একটি মরা নদী পার হতে হয়। পুলিস দলকে সাইকেল থেকে নেমে ওটা পার হ'তে হ'লো। ইতিমধ্যে আমরাও নদীর ধারে এসে পড়েছি এবং আমাদের সংখ্যা পাঁচশ ছাড়িয়ে গেছে। পুলিস দুটো ওপারে গিয়েই আমাদের দিকে রাইফেল তাক করলেন। এতে জনতা একটু থমকে দাঁড়ালো। একজন কর্মী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা গুলি চালাতে পারে কিনা। আমি একটু জোরেই বললাম ওরা গুলি চালাতে পারে, কিন্তু গুলি চালালে যেন ওদের একজনও ফিরে যেতে না পাবে। এই বলে আমি এগিয়ে গেলাম। সাথে সাথে জনতা আরও দ্রুত এগিয়ে চললো। দেখা গেল চারদিক থেকে অসংখ্য লোক লাঠি, কুড়ুল, কোদাল, গাছের ডাল যিনি যা পেয়েছেন তাই নিয়েই ছুটে আসছেন। নবাব নূরুল উদ্দিন (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র উত্তরবঙ্গে

কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কৃষকরা দেবী সিংহের অত্যাচার বন্ধ এবং বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হন। রংপুর ছিল তাঁদের প্রধান কেন্দ্র। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণ সমবেত হয়ে নূরুল উদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে নবাব বলে ঘোষণা করেন) ও দেওয়ান দয়াশীলের (নূরুল উদ্দিন নবাব নির্বাচিত হয়ে দয়াশীল নামক এক প্রবীণ কৃষককে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে বাজা উপাধি দেন) অনুগামীদের বংশধব এরা। এঁদেব শিরায় শিবায় পূর্বপুরুষের সংগ্রামী রক্তের স্পন্দন আজও সমভাবে বর্তমান। আমি ধবে নিলাম সংঘর্ষ অনিবার্য এবং সেই হিসেবে সকলকে প্রস্তুত হতে বললাম। একটি দিক তখনও খোলা ছিল। পুলিস দল বেকায়দা বুঝে সেই পথে পালিয়ে গেল। এই ঘটনাব পব প্রায় ছু মাস তারা ঐ অঞ্চলে আসেন নি। তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই ছু মাস ঐ অঞ্চলে চুরি ডাকাতি বা অন্য কোন প্রকার সমাজ-বিরোধী ঘটনা ঘটেনি। সকলে যেন সত্যযুগে বাস করেছেন। যে সব কর্মী রাইফেল কেড়ে নেবার দাবি করেছিলেন তাঁরা তখন আমাকে বলেছিলেন যে রাইফেল কেড়ে না নেওয়া ঠিকই হয়েছিল; এই ভাল হয়েছে।

সেদিন পুলিসের বে-ইজ্জতি পলায়নে সাধারণ মানুষের মধ্যে আশা ও ভবসা বেশ উচ্চ পর্যায়ে ওঠে। সমস্ত দিকে এই সংবাদ তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণাংশের বর্গাদারদের যেটুকু দ্বিধা ছিল তা তারা কাটিয়ে এগিয়ে আসেন। দূর দূর অঞ্চল থেকে সভা করাব ডাক আসছিল। এত বেশি সভা কবতে হচ্ছিল যে, আমরা সংগঠনের দিকে সে রকম নজরই দিতে পারি নি। অপরপক্ষে জোতদারদের মধ্যে দেখা দেয় দারুণ নৈরাশ্য। সবই তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে।

ডিমলা থানায় চোর-ডাকাতের সংখ্যা কিছু বেশিই ছিল। তারা আবার বর্গাদারও ছিল। এই ছুটো পেশাতেই তারা জোতদারদের দ্বারা শোষিত হ'তো। ডাকাতি করা মাল নিজেদের বাড়িতে রাখা

বিপদজনক। জোতদাররা ছিলেন তাদের খলিয়াৎ। তারা এই মালে তেভাগা কায়েম করেছিলেন। তারা ডাকাতদের দিতেন একভাগ নিজেরা নিতেন তুভাগ। এর থেকে অবশ্য একটি অংশ যেত থানাদারদের পকেটে। এই কারণে ডাকাতদের মধ্যে বেশ বিক্ষোভ ছিল। কৃষক সমিতির তেভাগা আন্দোলন ও জমিব পুনর্বণ্টনের দাবি সহজেই তাদের আকৃষ্ট করে এবং অনেকে আন্দোলনে যোগদান করেন। তাদেব মধ্যে কয়েকজন বেশ ভাল সংগঠক হয়েছিলেন। সাময়িকভাবে হলেও তাদেব মনেব পরিবর্তন হয়েছিল। এরাই ছিলেন জোতদারদের লাঠিয়াল। তাদেব মনে এই পরিবর্তন আসায় জোতদাবরা অসহায় হয়ে পড়েন। েসব চোর-ডাকাতেব মনের পবিবর্তন হয়নি তাবাও জাগ্রত জনশক্তির ভয়ে ওকাজে েতে পাবেন নি।

ইতিমধ্যে ধানকাটা শুরু হয়ে যায়। স্থানীয় কর্মীরাই বর্গাদারদের নিয়ে বৈঠক কবে দিন ঠিক করে ধান কেটে নিজ নিজ আঙ্গিনায় ধান তুলতে থাকেন। জোতদারদের ক্ষমতা হয়নি বাধা দেবার। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ চেষ্টা করে বাতের আঁধারে সেই ধান চুরি করে নিয়ে যাবার বা, বর্গাদারের ওপর হামলা করার। তাতেও তারা বিফল হয়। রংপুরের গ্রামে শঙ্খের চল ছিল না। সিঙ্গা কারও কারও বাড়িতে ছিল তাও খুব কম। কাজেই ঠিক হয়েছিল কোনখানে জোতদাব বা পুলিসের আক্রমণ হলে তারা 'হো হো' শব্দ তুলবে। যারা সেই শব্দ শুনবে তারাও 'হো হো' শব্দ করতে করতে সেই দিকে লাঠি নিয়ে দৌড়ে যাবে। এই করেই জোতদারদের হামলা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই 'হো হো' শব্দ জোতদার ও পুলিস উভয়ের মধ্যেই দারুণ ভীতির সঞ্চার করেছিল।

ধানকাটা শুরু হবার পূর্বে বহু হাটে আমরা কৃষক মিছিল তুলেছি এবং তেভাগা আন্দোলনের প্রচার করেছি। কুচবিহারের মেখলিগঞ্জ মহকুমা ডিমলা থানার সংলগ্ন। সেখানে একটি খুব বড় হাটে (ঠাকুর-গঞ্জহাট) আমরা তুদিন মিছিল তুলেছিলাম। ডিমলা থানার উত্তরাঞ্চলের

বহু কৃষক ঐ হাট করেন। আমাদের মিছিল ও ডিমলার আন্দোলনের প্রভাবে মেখলিগঞ্জ মহকুমার কয়েকটি গ্রামের বর্গাদারেরা একজনকে রাজা ও একজনকে মন্ত্রী নির্বাচিত করে এই আন্দোলন করেন। মন্ত্রীর নামছিল উমির্চাদ বর্মণ। রাজার নাম আমার মনে নেই। ১৯৫২ সালের নির্বাচনের সময়ে রাজা যোগদান করেন কংগ্রেসে এবং মন্ত্রী যোগদান করেন পি. এস. পি. তে। তিনি মাঝারি কৃষক ছিলেন। বলা যায় তারই নেতৃত্বে বর্গাদারেরা ধান কেটে নিজ নিজ বাড়ীতে তোলেন। একদিন থানার জমাদার ও দুজন সিপাই জোতদারদের সাহায্য করতে এসে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যান।

আমরা বিচার বিবেচনা করেই ডিমলার জোতদারদের নেতা যাদু মিঞাদের বাড়ীর নিকটের হাটটি (খগার হাট) বাদ রেখেছিলাম। একে হাটটি বেশ ছোট ছিল। হাটের ওপরেই ছিল জমিদার কাছারি। তার নায়েব থেকে আরম্ভ করে পাইক পর্যন্ত সব যাদুমিঞাদের লোক। তাছাড়া যাদুমিঞাদের সব শরীকের বাড়ি ওখানেই। বিনা কারণে কোন স ঘর্ষে যাবার ইচ্ছে আমাদের ছিল না। কিন্তু একদিন যাদুমিঞা ঘোষণা করলেন কমিউনিষ্টরা যত হাটেই উঠুক, আমাদের হাটে উঠতে পারবে না। এখানে এলে কয়েকটি লাশ ফেলে যেতে হবে। এতে কর্মীদের মধ্য থেকে দাবি উঠলো ঐ হাটে উঠতেই হবে। আমরাও রাজী হ'লাম এবং তার প্রস্তুতি চালালাম। কর্মীদের কয়েকজন বললেন, আটঘড়িটারী নামক গ্রামটির সব লোকই ডাকাত এবং তারাই যাদুমিঞাদের লাঠিয়াল। তাদের পক্ষে পেলে বিনা বাধায় হাটে ওঠা যাবে। দুজন কর্মী তাদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করেছেন। ডাকাতরা বলেন, তারা একজন নেতার সাথে এ বিষয়ে আলাপ করতে চান। ঠিক হ'লো আমি তাদের সাথে আলাপ করতে যাব। একরাতে কয়েকজন কর্মীকে সাথে নিয়ে তাদের পাড়ায় গেলাম এবং তাদের সাথে আলাপ করলাম। আলাপে তারা খুশী হলেন এবং বল্লেন, "আমরা ধান চাষ করেও যেমন আমাদের মেহনতের ভাগ পাই

না তেমনই জীবন বিপন্ন করে যে মাল ডাকাতি করে নিয়ে আসি তারও ন্যায্য ভাগ পাই না। মাল ওদের হাতেই তুলে দিতে হয়। ওরা দুভাগ নিয়ে একভাগ আমাদের দেয়। আমরা এই সুবিধে পাই যে দারোগা পুলিসের হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। আপনারা যা নিয়ে লড়ছেন তাতো আমাদেরই ভালর জন্য। ধানের ভাগ বৃদ্ধি পেলেও আমাদের লাভ হবে এবং জমির পুর্নবণ্টন হলে আমরাও জমি পাব। আমরা ডাকাত বলে লোক আমাদের ভয় করে ঠিকই কিন্তু ঘৃণাকরে অনেক বেশি। আমরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাই। আপনাদের আন্দোলনে আমাদের সমর্থন আছে। তবে নানাভাবে যাদুমিঞাদের হাতে আমরা বাঁধা। আমরা প্রকাশ্যে আপনাদের সাথে যেতে পারবো না। তবে আপনাদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরতেও যাব না তা যত চাপাই আমাদের ওপর আসুক না কেন। আমরা ডাকাত, আমরা কখনও কথার খেলাপ করি না।" তারা তাদের কথা রেখেছিলেন।

একদিন ৩০০ / ৩৫০ কর্মীর একটি মিছিল সত্যই খগার হাটে উঠলো। প্রত্যেকের হাতে ছিল লাঠি। মিছিলে কয়েকটি লাল পতাকাও ছিল। পরিচালনায় ছিলাম আমি ও গাইবান্ধার কছির উদ্দিন আহম্মদ। মিছিলটি ছিল খুবই জঙ্গী ও দৃঢপ্রতিজ্ঞ। রাস্তায় একটি স্থানে পড়ে যার একদিকে আটঘড়িটারী ও অপরদিকে যাদু মিঞাদের বাড়ী। সেখানে এসেই কর্মীরা যেন আরও জঙ্গী হয়ে উঠলেন। তাদের হাতের লাঠি আরও ওপরে উঠলো, শ্লোগানের পর্দাও গেল চড়ে। আমাকে এবং কছির মিঞাকে তারা সামনে থেকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন যদি কোন আক্রমণ আসে এই আশঙ্কায়। ভেবে অবাক হ'তে হয় এই উত্তেজনার মধ্যেও তারা নেতাদের নিরাপত্তার কথা মনে রেখেছিলেন। এইটাই প্রমাণ করে সংগ্রাম সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলেন তারা। আজ এই কথা ভেবে আমি খুবই বিচলিত হই যে আমাদের ওপর যে আস্থা রেখে তারা সব রকম বিপদ আপদ তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন আমরা সে আস্থার মূল্য দিতে পারলাম কই ?

আমরা বিনা বাধায় হাটে উঠলাম। অবনী বাগচী অন্যপথে হাটে গিয়েছিলেন। হাট পরিক্রমা করে একটি সভা করা হলো। সভায় যাতুমিঞা সমেত কিছু জোতদার উপস্থিত ছিলেন। আমি আমাব বক্তব্যে জোতদারদের তেভাগা স্বীকার করে নিয়ে এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে আহ্বান জানালাম। সাথে সাথে এই হুঁসিয়ারীও দিলাম যে, তারা পীড়নমূলক যে কোন পন্থা গ্রহণ করলে যে আগুন জ্বলে উঠবে তাতে তারাই পুড়ে মরবেন। আমার বলা শেষ হ'লে যাতুমিঞা কিছু বলতে চাইলেন। তাকে বলতে দেয়া হলো। তিনি তার স্বভাব-সিদ্ধ মিষ্ট ভাষণে বর্গাদারদের ভাগবৃদ্ধির দাবিটি স্বীকার কবেও বলেন, তেভাগা খুব বেশি হয়ে যায়, ভাগটি নয় আনা সাত আনা করা হউক। তিনি বিশারি আদায় করবেন না বলে ঘোষণা করলেন। তিনি জানালেন যে, তিনি সব জোতদারকে এই দাবি মেনে নিতে বলছেন কিন্তু তারা রাজী না হয়ে ভুল করছেন। আমাদের তরফ থেকে বলা হ'লো সরকার এই দাবিকে ন্যায্য বলে মনে করে। কাজেই এই দাবি থেকে বর্গাদারদের সরে আসার কোন কথাই ওঠে না। হয় জোতদাররা এই দাবি মেনে নিন, না হয়, এর ফলাফলের জন্য প্রস্তুত থাকুন। এই কথা বলে সভা শেষ করে দেয়া হয়। হাটে মিছিল ওঠা এবং যাতুমিঞার নম্রভাব দেখে কর্মীদের মধ্যে একটি বিজয়গর্ব জেগে ওঠে। আমি তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলি যে, তারা যেন যাতুমিঞার মিষ্ট ভাষণে না ভোলেন।

কিছুদিন আগে থেকে ছোট ছোট জোতদারেরা কর্মীদের কাছে আপসের প্রস্তাব তুলতে থাকেন। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বিধবা ও নাবালোক জোতদার ছিলেন। বর্গাদারেরা শেষোক্তদের প্রতি সহানুভুতিশীল ছিলেন। একটি কর্মী বৈঠকে তারা এই সমস্যাটি তুলে বল্লেন, এদের সাথে আপোস করাই ভাল। আমি তাদের বলি যে, যদি তারা আন্দোলনে আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন তবে অবশ্যই আমাদের এই বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। তবে সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রীয়

ভাবে নেয়া প্রয়োজন। পরের দিনই একটি জমায়েত ছিল। তাতে এক বিধবা জোতদার তার নাবালক পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন। সেই রাতেই আমাদের কেন্দ্রীয় বৈটকে ঐ প্রস্তাবটির ওপর আলোচনা তুলি। অনেকেই মনে করেন, এদের সাথে আপোস করাই ভাল। কিন্তু জনাহুয়েক এই বলে আপত্তি তুললেন যে, এটা করতে গেলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। সেদিন কোন সিদ্ধান্ত হলো না। আমরা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও কর্মী ও বর্গাদারেরা আপোস করে নিয়েছিলেন। তারা ঠিকই করেছিলেন। আন্দোলনে কোন বিশৃঙ্খলা হয়নি।

সবচেয়ে শেষে কাটা হয়েছে যাহুমিঞাদের ধান। যেদিন ধানকাটা হবে তার আগের দিন রাতে স্থানীয় নেতা তন্নারায়ণ রায় এক বর্গাদারের বাড়িতে বর্গাদারদের নিয়ে একটি বৈঠক করছিলেন। সে বাড়িটি ছিল যাহু মিঞার বাড়ীর খুব কাছে। বৈঠক চলাকালে যাহু মিঞার নেতৃত্বে ২৫।৩০ জনের একটি দল অতর্কিতে বন্দুক নিয়ে বর্গাদারদের আক্রমণ করে এবং এলোপাথারি গুলি ছুড়তে থাকে। তাদের বাধা দিতে যেয়ে অনেকে আহত হন। জোতদারদের একজন ত্বড়িত গতিতে যেয়ে তন্নারায়ণের বুকে বন্দুক লাগিয়ে গুলি করে সবশুদ্ধ পালিয়ে যায়। তন্নারায়ণ সাথে সাথে মারা যান। গুলিতে সব চাইতে বেশি জখম হয়েছিলেন বাচ্চা মামুদ। ঘটনাটি এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে আশে পাশের লোক দৌড়ে এসেও আক্রমণকারীকে ধরতে পারেন নি। পুলিস তখন যাহুমিঞাদের বাড়িতে ছিল বলে শোনা গেছে। মণিকৃষ্ণ সেন ও মহী বাগচী ঘটনাস্থলে ছুটে যান। গোলাম কুদ্দুসও গিয়েছিলেন। আমি ও কছির উদ্দিন মাইল দুয়েক দক্ষিণে একটি সভা করতে গিয়েছিলাম। সংবাদ পেয়ে আমি আক্রমণ স্থলে চলে আসি। আমি যাবার পূর্বেই দারোগা এসে গৃহস্বামী ও অন্যান্য কয়েক জনের জবানবন্দী নেন ও মৃতদেহ নিয়ে চলে যান। বাচ্চা মামুদকে মাইল দুয়েক দূরে একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। আমি যাবার পূর্বেই কয়েক'শ লোক সেখানে জমায়েৎ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একদল

সেই রাত্রেই জোতদারদের বাড়ি আক্রমণ করতে চান এবং আর একদল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান। দ্বিতীয় মতটিই প্রাধান্য পায়।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় কিছুদিন ধরে বাধাহীনভাবে কাজ করে আমাদের মধ্যে একটি আত্মসন্তুষ্টির ভাব এসেছিল এবং সতর্কতার প্রয়োজন বোধ কমে গিয়েছিল। কর্মীদেরও আমরা সতর্কতা বোধ জাগ্রত করতে পারিনি। যাদু মিঞাদের বাড়ীর কাছে বৈঠক বসেছে অথচ পাহারা বা অন্যান্য আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। যাদু মিঞা সম্বন্ধে আমি যে সতর্ক থাকার উপদেশ দিয়েছিলাম তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় নি।

খুব ভোর হ'তেই আক্রান্ত স্থানে জনসমাগম হতে থাকে। সব অঞ্চল থেকে কর্মীরা এসে খবর দেন যে বড় জোতদাররা সব রাতেই পালিয়ে গেছে। হাজার পাঁচেক লোক সমবেত হয়েছিলেন। আমরা আলোচনা করে ঠিক করি যে, যাদুমিঞাদের সব শরীকের বাড়ি যাওয়া হবে। সাবালক ব্যক্তি যাদেরই পাওয়া যাবে তাদেরই ধরে আনা হবে। প্রয়োজন হলে প্রাণ নিতেও দ্বিধা করা হবে না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই শিশু ও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেয়া হবে না এবং বাড়ীও পোড়ানো হবে না। এই ঠিক করে আমি ও মহীবাগচী মিছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মিছিলে ঘন ঘন ধ্বনি উঠেছে, "খুনীদের শাস্তি চাই, যাদুমিঞার কাল্লা চাই।" সব স্থানেই দেখা গেছে খুনীরা তো বটেই, তাদের বাড়ির সব সাবালক ব্যক্তিই পালিয়েছে। কর্মীরা সব বাড়িতে ঢুকে দেখেছেন তারা নেই। সব বাড়ি থেকেই স্ত্রীলোকদের ক্রন্দনরব শোনা গেছে। আমরা যখন মিছিল নিয়ে ঘুরছি তখন একস্থানে দেখলাম একটি বাড়ির সামনে থানার দারোগা কাঁপতে কাঁপতে ১৪৪ ধারার আদেশটি পড়ছেন। আমরা তাকে ঘিরে ধরলাম। তিনি খুব দ্রুত আদেশটি পড়ে চলে গেলেন। তারপর ৩রা মার্চের (১৯৪৭) মধ্যে তাদের আর দেখা যায় নি। বড় জোতদাররাও ফেরার থাকলেন।

সমগ্র থানায় অবস্থাটা দাড়ালো এই রকম। থানা আছে; কিন্তু

তার কোন কাজ নেই। চৌকিদার-দফাদার আছেন, তারা সমিতির লোক। জোতদার মহাজন নেই। জমিদার কাছারী আছে, তার দরজায় তালা ঝুলছে। আছেন শুধু কৃষক ও তাদের নেতৃবৃন্দ। হাট বাজার নিয়মিত বসছে। ধান কাটা হচ্ছে। বর্গাদারেরা নিজ নিজ বাড়ীতে সেই ধান তুলে তিনভাগের একভাগ জোতদারের জন্য রেখে বাকীটা মারাই করে ঘরে তুলছেন। গ্রামে চুরি-ডাকাতি নেই। ঝগড়া ঝাঁটিও নেই। এ এক নতুন ধরণের সমাজ ব্যবস্থা।

সমস্ত ঘটনা এমনভাবে ঘটে গিয়েছে মনে হবে যেন এক অলৌকিক শক্তি কৃষকদের পক্ষে কাজ করেছে। কৃষকেরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে না অথচ জোতদার ও পুলিস কৃষকদের হাতে ময়দান ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছে। আসলে যে শক্তি কাজ করেছে তা হচ্ছে থানার প্রতিটি কৃষকের ঐক্য এবং সংগ্রামী মানসিকতা যা সৃষ্টি হয়েছিল বহু বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নেতৃত্বের সংগত ও অপেক্ষাকৃত সঠিক কর্মকৌশল। বিপ্লবী তন্নাবায়ণের আত্মদান এই প্রক্রিয়াকে তবান্বিত করেছে।

এতকাল বর্গাদারেরা ধান কেটে তুলেছেন জোতদারের খামারে। এবার ধান উঠেছে তাদের নিজ আঙ্গিনায়। বাড়ির স্ত্রীলোকেরা এই প্রথম তাদের রক্তে বোনা ধান নিজ আঙ্গিনায় উঠতে দেখলেন। তারা দল বেধে প্রতিমা দেখার মত প্রতিবাড়ির ধান দেখে বেরিয়ে ছিল। এটা ছিল তাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সমিতি এবং তার নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বেড়েছে অনেক।

বড় জোতদাররা ফেরার ছিলেন তারা তাদের ধান নিতে পারেন নি। খুব ছোট জোতদারদের সাথে বর্গাদাররা আপোস করেছিলেন। মাঝারি জোতদাররা যা পেয়েছেন তাই নিয়ে গেছেন। কেউ বা রসিদ দিয়েছেন, কেউ দেন নি।

গুলি চালনার পরে জেলা শহর থেকে একটি বে-সরকারী তদন্ত কমিটি এসেছিল। তাতে ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা

জীতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী (উকিল), রংপুরের বিখ্যাত লাহিড়ী পরিবারের ভবতারণ লাহিড়ী জগদীশ দাসগুপ্ত (উকিল), ডাঃ নির্মল বোস মহিলা নেত্রী বিমলা দত্ত এবং আরও অনেকে। এরপর এসেছে কলকাতা এবং রংপুর থেকে ছাত্র প্রতিনিধি দল। এর ফল খুবই ভাল হয়েছিল। কৃষকরা যে তাদের সংগ্রামে একা নন এটা তারা প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু নেতৃত্বের ত্রুটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ পড়েছে। রেল শ্রমিকদের তরফ থেকে প্রথম দিকে তাদের সমর্থন জানানো হয়েছিল, কিন্তু গুলি চালনার পরে কোন প্রতিনিধি দল আসেনি।

ধান কাটা শেষ হয়ে গেলে কৃষক হত্যার প্রতিবাদে এবং দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে শাস্তিদানের দাবিতে ডিমলা থেকে শ' পাঁচেক লোকের একটি র‍্যালী কুড়ি মাইল হেঁটে নীলফামারী শহরে যায়। পথে ডোমার থেকে সমপরিমাণ কৃষক যোগদান করেছিলেন। ডিমলার র‍্যালী পরিচালনায় মহীবাগচী, কছির উদ্দিন ও আমি ছিলাম। ডোমারের কৃষকদের সঙ্গে ছিলেন কালীপদ দে ও নারায়ণ ব্যানার্জী। অবনী বাগচী, মণিকৃষ্ণ সেন ও সুধীর মুখার্জী আগেই নীলফামারী চলে গিয়েছিলেন। শহরের পার্টির সভ্য ও সমর্থক বহুলোক র‍্যালীকে অভ্যর্থনা জানান এবং র‍্যালীর সাথে শহর পরিক্রমণ করেন। রাস্তার দু'ধারে নারী ও পুরুষ বহুলোক দাড়িয়ে কৃষকদের উৎসাহ দেন। র‍্যালীর ধ্বনি ছিল, "খুনীদের শাস্তি চাই, সাতু মিঞার ফাঁসি চাই।" মহকুমা শাসকের কোর্টের সামনে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে একটি সভা করা হয়। তারপর র‍্যালীটি আবার নিজ এলাকায় ফিরে যায়। নীলফামারীর যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ মনোজ্ঞ ঘোষ, বিমল ভৌমিক, মোহিত মাষ্টার ও ক্ষিতীশ দত্তর নাম উল্লেখযোগ্য।

নীলফামারী র‍্যালী থেকে ফেরার পরে কিছু কর্মীর মধ্যে একটি নতুন চিন্তা দেখা যায়। তারা ভাবতে থাকেন এ আন্দোলনে আমরা জিতেছি। এরপর আরও বড় সংগ্রাম করতে হবে। তখন অবশ্যই পুলিসের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে যেতে হবে। পুলিসকে ফাঁদে ফেলে

ধ্বংস করার জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করতে হবে এসব নিয়ে তাদের মধ্যে পরামর্শ হ'তে থাকে। তারা এসব আমাদের কাছে প্রকাশও করেছিলেন। আমরা তাদের উৎসাহই দিয়েছিলাম। এই সময়ে কাকতলীয় ব্যাপারের মত সূর্য কলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে সন্ধ্যার কিছু আগে এই কলঙ্ক দেখা যেত। তাই দেখে কৃষকরা মনে করেছেন যে, শহীদ তন্নারায়ণ সূর্যে গিয়ে লালঝাণ্ডা নিয়ে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলছেন। তাদের ধারণা হয়ে গেল তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

এদিকে যারার মহকুমা লীগ নেতাদের একটি চিন্তা দেখা দিল যে, কী করে এই জাগ্রত জনরোষ থেকে জোতদারদের রক্ষা করা যাবে। কৃষকদের ঠাণ্ডা করার জন্য প্রথম এলেন মহকুমা মুসলীম লীগের সভাপতি দবীর উদ্দিন আহম্মদ (ইনি পাকিস্তান হবার পরে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হন)। তিনি একটি সভা ডাকেন। তাতে লোক বেশি হয় নি। তাদের তিনি বল্লেন, যারা খুন করেছেন আদালত অবশ্যই তাদের শাস্তি দেবে। আপনারা আমাদের পক্ষে কথা বলতে আসেন নি? আজ খুনীদের পক্ষ নিয়ে বলতে এসেছেন কেন? লীগ নেতার কাছে এর কোন জবাব ছিল না। তিনি সভা থেকে চলে যান। এরপর আসেন লীগ এম. এল. এ. খয়রাত হোসেন। তিনিও কিছু করতে পারেন না, চলে যান।

আমরা গ্রামে গ্রামে বৈঠক করতে থাকি। ধান পাওয়া গেল। এখন জমিতে চাষের অধিকার রাখতে হবে। সুতরাং যে আন্দোলন শুরু হয়েছে এর আগুন নেভানো চলবে না। যে সংগঠন গড়ে উঠেছে তাকে আরও বাড়াতে হবে। ডিমলা এলাকার বাইরের কৃষক যারা এমনও আন্দোলনে আসেননি তাদের আনার ব্যবস্থা করতে হবে। আন্দোলনকে আরও উচুস্তরে তুলতে হবে প্রভৃতি বলা হ'তো। কৃষকরাও খুব উৎসাহের সাথে যোগ দিচ্ছিলেন। সব সাবালক মানুষকে কৃষক সমিতির সভ্য করা হচ্ছিল।

হঠাৎ ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে পূর্বোক্ত এটলী সাহেবের ঘোষণা বের হবার পর সাধারণ কৃষকদের মধ্যে একটি মনোভাব দেখা দেয় তা হচ্ছে দেখিনা স্বাধীন সরকার কী করে। ইংরাজ না থাকলে তো তার আইনও থাকবে না। নতুন আইনও থাকবে না। নতুন আইন হবে। সে আইনতো আমাদের পক্ষেও যেতে পারে। সুতরা এখন আর করবার কিছু নেই। আমাদের পার্টি নেতৃত্ব ঐ অবস্থায় গণ-আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর করনীয় কী তার নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আমরাও বিভ্রান্ত ছিলাম। কী যে তখন করনীয় তা ঠিক করতে পারি নি। শুধু তাদের এইটুকু বলতাম ইংরাজ দেশের ধনী নেতাদের হাতেই ক্ষমতা দেবে। তখনও লড়াই করেই কৃষক মজুরের দাবি আদায় করতে হবে। আপনা থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। আমাদের কথাগুলো কর্মীরা ঠিক মনে করলেও সাধারণ কৃষক সঠিক বলে মেনে নেন নি।

আমরা পরবর্তী আন্দোলন সম্পর্কে যাই মনে করি না কেন তখনকার মত বেশ বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমরা ধারণাই করতে পারি নি যে এই ঘোষণার এগার দিনের মধ্যেই আমাদের ওপর একটি ব্যাপক আক্রমণ হতে চলেছে। যে সমস্ত সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা আমরা মেনে চলতাম তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হ'লো না। ৩১ মার্চ হামলার কিছুক্ষণ পূর্বে সংবাদ পেলাম তিনট্রাক পুলিস সাতু মিঞার বাড়িতে এসেছে কৃষকের ওপর হামলা করতে। কিন্তু তা বিশ্বাস করলাম না। আমি সংবাদটি বিশ্বাস করতাম তবে কয়েকজন কর্মীকে গ্রেফতার থেকে রক্ষা করা যেত। আজ এতদিন পরেও আমার এই ভুলের জন্য অনুশোচনা হয়। আমরা যে কী করে ধরে নিলাম, যাঁদের প্রতিনিধি ঐ মন্ত্রীসভা তারা তাদের ধান পাবেন না, আর মন্ত্রীসভা নিষ্ক্রিয় থাকবে তা একটি রহস্য। অবশ্য এই রহস্যের গোড়ায় আছে আমাদের মধ্যবিত্ত সুলভ চিন্তাধারা।

তিন ট্রাক পুলিস এসেছিল ঠিকই। তবে তারা যে খুব ভয়ে ভয়ে ছিল তা বেশ বোঝা গেছে। তাদের তালিকা অনুযায়ী সকলকে ধরতে

যেতে পারে নি। অতি দ্রুত যাদেরই হাতের কাছে পেয়েছে তাদেরই ধরে নিয়ে গেছে। সংবাদ যা পেয়েছি তাতে বলা যায় যে, পনের মিনিটের মধ্যে তারা কাজ শেষ করে চলে গেছে। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে অনেককেই তারা ধরেছে। এমন লোককেও নিয়ে গেছে যারা অনেক দূর অঞ্চল থেকে আত্মীয় বাড়িতে এসেছিলেন। বহিরাগত নেতাদের মধ্যে মহী বাগচী ধরা পড়েছিলেন। কছির উদ্দিন ধরা পড়েছিল কিনা এখন মনে নেই। তবে আমি, অবনী বাগচী ও মণিকৃষ্ণ সেন ধরা পড়িনি।

এই গ্রেফতার সাময়িক ভাবে কিছু ভীতি সঞ্চার করলেও কৃষকের মনোবল ভাঙ্গতে পারে নি। এটলীর ঘোষণার ফলে আর কিছু এখন করার নেই বলে যে ধারণাটি হয়েছিল তা বেশ ধাক্কা খায়। তারা বুঝতে পারেন তখনও তাদের সমিতি ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য দেশ স্বাধীন হলে যে তাদের কাজ অনেক সহজ হবে সে ধারণাটি থেকেই যায়।

মণিকৃষ্ণ সেন ঐ সময়ে ডোমারে ছিলেন। সুধীর মুখার্জী ধরা পড়েছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ তখন ডোমারে ছিলেন না অন্যস্থান থেকে চলে যান।

গ্রেফতারের পরে আমি ও অবনী বাগচী কয়েকটি স্থানে ঘুরেছি। যেখানে গিয়েছি সেখানেই আশ্রয় পেয়েছি। কৃষকরা আমাদের কথা শুনেছেন। তখন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা খুব একটা হয় নি। কয়েকদিন পরে আমি এবং অবনী বাগচী জেলা কেন্দ্রে চলে যাই। দিন সাতেক পরে আমি ডিমলায় ফিরে আসি এবং ডিমলা ও ডোমার অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে থাকি। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত যাদু মিঞাদের সকল শরীক এবং ডোমারের একটি জোতদার তাদের ধান নিতে আসেননি তা আমি দেখেছি। সে ধান বর্গাদারের আঙ্গিনায় জমা করা ছিল॥

নৃপেন ঘোষ

স্মৃতিতে রংপুরের কৃষক সংগ্রাম

১৯২৪-২৫ 'এ ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা'য় কৃষকেরা ব্যাপক আকারে জোতদার ও মহাজনদের বাড়ী চড়াও করে এবং লুটপাট করে। কৃষকরা লুটপাট করে নিয়ে যেতো মূলতঃ জোতদার ও মহাজনদের জমিক্রয়ের দলিল ও কবলা ; তা নিয়ে গিয়ে জোতদার ও মহাজনদের বাড়ীর সামনেই পুড়িয়ে ফেলতো। এই অবস্থাকে হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণীর এক প্রতিক্রিয়াশীল অংশ হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হচ্ছে এইভাবে আখ্যা দেওয়া শুরু করে। হিতবাদী, সঞ্জীবনী, আজাদ প্রভৃতি পত্রিকা তা নিয়ে প্রচার অভিযানে নামে। পরোক্ষ-ভাবে ইংরাজরাও একে মদৎ দিতে শুরু করে। কিন্তু মুখ্যতঃ তা ছিল মহাজন ও জোতদারদের সঙ্গে কৃষকদের শ্রেণী সংঘর্ষ।

ঐ সময় কৃষকের সবচেয়ে বেশি জমি জোতদার মহাজনদের হাতে হস্তান্তর হয়। ফলে কৃষক নিঃস্ব ভূমিহীণ দাসে পরিণত হতে শুরু করে। এরই ফলশ্রুতি প্রজাসত্ব আইন ও ঋণশালিসী বোর্ড।

১৯৩৭ 'এ প্রজাসত্ব আইন পাশ হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীরা ভোট দেয়। প্রজাসত্ব আইন পাশ হলে প্রজারা জমির সত্ব পায়। তখন থেকেই জোতদার ও মহাজনদের সৃষ্টি হয়। জমিদাররা কিছু জমি জোতদার ও মহাজনদের পত্তন দেয়। ফলে, জমির শর্ত নিয়ে জটিলতার সূত্রপাত হয়। এরপরেই শুরু হয় জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের কৃষকের উপর শোষণ। কৃষকের সমস্ত ক্ষমতা তখন কুক্ষিগত ছিল জমিদার জোতদার ও মহাজনদের হাতে। কৃষকের হাতে কোন ক্ষমতাই ছিল না। ফলে, কৃষকদের উপর জমিদার, জোতদার ও মহাজনেরা বিভিন্ন রকম অত্যাচার শুরু করে।

ইংরাজী ১৯৩৯ সালে গণ্ডী আন্দোলন প্রথম শুরু হয় জলপাইগুড়ি জেলায়। রংপুর জেলার 'লোহাকুচি' হাট থেকে তোলাগণ্ডী আন্দোলন

প্রথম শুরু হয়, যা রংপুর জেলার কুচবিহার বর্ডারে অবস্থিত। এই হাটটি ছিল সবচেয়ে বড় তামাকের হাট। এই হাট থেকেই কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে শ্লোগান দেওয়া হয় 'তোলাগণ্ডী বন্ধ কর।' কৃষকদের এই দাবী প্রথমে জমিদাররা মেনে নেন নি। ফলে, কৃষক সমিতি শ্লোগান দেয় 'কৃষক সমিতির হাট বসাও' এবং হাট বসেও। তখন জমিদার কৃষকগণের স্থায়ী দোকান থেকে 'তোলাগণ্ডী' নেয়—কিন্তু সাধারণ কৃষকদের কাছ থেকে 'তোলাগণ্ডী' নেওয়া বন্ধ করে দেয়। এই সাফল্যের পরে ব্যাপকভাবে আন্দোলন অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত হয়। এরপর শুরু হয় 'কাঁকনা' থানার অধীনে ভুষভাণ্ডার হাটে। সেখানে আন্দোলনের উপর পুলিসের গুলি চলে। ফলে আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, কুড়িগ্রাম মহকুমার উলিপুর হাট, চিলমারির হাট এবং অন্যান্য হাটে। সেখানেও আন্দোলন সফল হয়।

কৃষক সমিতির মূলদাবী ছিল হাটে যে সমস্ত স্থায়ী কৃষকের দোকান আছে তা থেকে যে খাজনা আদায় হয় তার দ্বারা হাট কমিটি করতে হবে ও সেই হাট কমিটির হাতে পয়সা জমা দিতে হবে এবং তা হাটের উন্নতি-কল্পে ব্যায় হবে। ফলে এই আন্দোলন রংপুর জেলাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। একমাত্র রংপুর জেলাতেই এই আন্দোলনের জন্য দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং বহু হাটে কৃষক স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কমিটি তৈরী ক'রে 'তোলাগণ্ডী' বন্ধ করে দেয়। কোনও কোনও জায়গায় কৃষক সমিতি হাট বসায়, যা কৃষক সমিতির হাট নামে পরিচিত। এই রকম হাট বহু জায়গায় এখনও আছে। এই আন্দোলন সে সময় সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৩৯-৪০ সালে শুরু হয় কৃষকদের বকেয়া খাজনার সুদ মুকুব আন্দোলন। যেমন, রংপুর জেলার 'টেপা' জমিদারীতে সুদ মুকুব আন্দোলন। যেমন, চন্দনপাট গ্রাম থেকে প্রায় হাজার লোকের মিছিল

৪০ মাইল রাস্তা হেঁটে রংপুর শহরে এসে তারা কোর্টে ধর্ণা দেয় এবং সেখানে কৃষকদের এই দাবিকে কংগ্রেসীরা সমর্থন করে ও কৃষকদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে। কংগ্রেস অফিস ময়দানে বিকেলের দিকে জনসভা হয়, কংগ্রেসের জিতেন চক্রবর্তী ও জিতেন সেনের নেতৃত্বে। এরপরে জমিদারের বিরুদ্ধে খাজনা মুকুব আন্দোলন শুরু হয় মালদহ জেলার চাঁচল রাজের জমিদারীতে। সেখানেও এই আন্দোলন সাফল্য হয়। জমিদাররা কৃষকদের চাপে পড়ে প্রায় এইদাবী মানতে বাধ্য হয়। রংপুর জেলার কংগ্রেসীরা মোটামুটিভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির আয়ত্তাধীনের মধ্যে ছিল। কিন্তু অন্যান্য জেলাতে তা ছিল না।

১৯৪০-৪৩ সাল। এই সময় বাংলার অসংখ্য কৃষক মারা যায় মন্বন্তরে। বহুগ্রাম মনুষ্যহীন হয়ে পড়ে। সরকার 'ফ্লাউড কমিশন' বসায় এবং ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কৃষক সমিতি তেভাগার শ্লোগান দেয়। সে সময় একটি আশ্চর্য্যের বিষয় হলো যে, মন্বন্তরের ফলে কৃষক আন্দোলন মজুর উদ্ধার এবং লঙ্গরখানা এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কৃষক নেতারা কৃষকদের প্রত্যক্ষ স গ্রামের জন্য কোন বিশেষ শ্লোগান দিলো না। ফলে কৃষক না খেয়ে মরলো কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষে হাত তুলতে পারলো না। তারই ফল স্বরূপ দাড়ালো ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কৃষকেরা কোন কৃষক নেতাকে ভোট দিলো না. ভোট দিলো কংগ্রেসীদের। এর থেকেই জন্ম নিলো সংস্কারবাদী আন্দোলন এবং এই আন্দোলন এখনও অব্যাহত। '৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসীরা শ্লোগান তুলেছিল 'আইনের জন্য ভোট দাও', 'স্বাধীনতার জন্য ভোট দাও'। 'তেল নুনের জন্য ভোট দিও না' কারণ, যদি গর্ভঃমেন্ট তৈরী না করো তা হলে 'তেল নুন' পাবে কোথা থেকে ?

১৯৪৬ 'এ হয় আইন সভার নির্বাচন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে এই নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির তিনজন প্রার্থী জয়লাভ করেন—যথা, জ্যোতি বসু, রূপনারায়ণ রায় ও রতনলাল ব্রাহ্মণ। কংগ্রেস এই

নির্বাচনে প্রচণ্ড বিরোধীতা করে এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করে। প্রায় বহু জায়গাতে কম্যুনিষ্ট পার্টির পোলিং এজেন্টদের বুথে বসতে দেয় নি এবং তাদেরকে প্রচণ্ড মারধোর করে ভাগিয়ে দেয়। জ্যোতিবসু এই প্রথম আইন সভার সভ্য হন। এই আইন সভার মধ্যে দিয়ে কৃষকদের দাবী দাওয়া ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে এবং তারমধ্যে আধিয়ারদের প্রশ্ন ছিল—যেমন, নিজ খোলানে ধান তোলো, বকেয়া ধানের সুদ মুকুব করো, খোলান খরচ নেওয়া চলবে না, দুঃস্থ কৃষকদের জমিদারের দাস থেকে মুক্ত করো ইত্যাদি। তেভাগার প্রথম দিকে এই শ্লোগান গুলিই প্রধান ছিল এবং এই দাবীতেই ভাগচাষী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

জেলা কৃষক সমিতির মিটিং'এ ঠিক হয় রংপুর জেলায় ডিমলা ও জলঢাকা এই দু'টি থানাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। সে সময় প্রচণ্ড হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর প্রচার হয়। অপরদিকে ছাত্র বিক্ষোভ, শ্রমিক বিক্ষোভ, সৈন্য বিদ্রোহ—সমগ্র বাংলায় এক অদ্ভুদ পরিস্থিতি। ডিমলা থানা মোটামুটি ছিল হিন্দু প্রধান অঞ্চল কিন্তু জোতদাররা ছিল প্রধানত মুসলমান। জলঢাকা থানা ছিল মূলতঃ মুসলিম প্রধান অঞ্চল। জলঢাকায় আন্দোলন শুরু হয় মূলতঃ হিন্দুকর্মী দিয়ে এবং ডিমলাতে কিছু মুসলমান কর্মীও ছিল। তখন প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সত্বেও কোথাও হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয় নি। কৃষক সমিতি মূলতঃ আধিয়ার আন্দোলনের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ধ্বনি তুলতে সক্ষম হয়নি। ফলে, এই আন্দোলন অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটিই এই আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা।

এই আন্দোলনে কৃষক মহিলারা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে ও আন্দোলনের জন্য বিভিন্নভাবে লড়াই করে। যেমন, আণ্ডার গ্রাউণ্ড কর্মীদের রক্ষা ও দেখাশুনা থেকে শুরু করে প্রকাশ্য ময়দানে পুলিসের সঙ্গে লড়াইতেও এরা সামিল হয়েছে।

একদিনের ঘটনা : একজন মুসলিম জোতদারের হিন্দু আধিয়ার তার ধান নিজ খোলানে তুলে দিলো, তারপর সেই খোলান ভাঙ্গা হয়। তখন জোতদার পুলিস নিয়ে এসে জোর করে ধান কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কৃষকেরা এই খবর পেয়ে জমায়েত হ'তে শুরু করে এবং তারা পুলিসের হাত থেকে অস্ত্র ও ফসল কেড়ে নিয়ে পুলিস ও জোতদারকে ভাগিয়ে দেয়। এই ঘটনায় এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যে চারপাশ থেকে প্রায় দশ হাজার কৃষক মাঠে জমা হয়। কৃষকদের খাওয়ানোর জন্য মহিলাকর্মীরা প্রায় পাঁচমণ চাউল তুলে ভাজা করে এবং এক মুঠো করে চালভাজা দিয়ে পাঁচমণ ভাজা চাল কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে। তাতেও না কুলালে ঐ কৃষক জমায়েত থেকে প্রশ্ন ওঠে এখন কি করা হবে? তখন একদল প্রস্তাব দেয় যে, কৃষকেরা গিয়ে থানা আক্রমণ করবে; আরেক দল প্রস্তাব দেয় যে, থানায় যাওয়ার দরকার নেই। এই ধান রক্ষা হোক এবং অন্যান্য সব খোলান ভাঙ্গা হোক। বেশির ভাগ ভোটে থানা আগ্রমণ করা পাশ হয় এবং সন্ধ্যার পরে মশাল জ্বালিয়ে কৃষকেরা থানা অভিমুখে রওনা হয়। যতদূর খবর আসে তার থেকে জানা যায় যে—থানায়ালারা থানা থেকে সব পালিয়ে যায়, এমনকি দারোগাও! তখন একজন কৃষক নেতা রাস্তার মাঝখানে একটি গাছের উপরে মশাল হাতে উঠে পড়ে বলেন যে, যুদ্ধের নিয়ম হচ্ছে সেনাপতির আদেশ মানতে হবে, সুতরাং তার আদেশ, থানায় যাওয়া চলবে না, ফিরতে হবে এবং ধান রক্ষা করতে হবে। তখন কৃষকেরা ক্ষুণ্ন মনে ধান রক্ষা করার জন্য ফিরে আসে। এই আদেশ উক্ত কৃষক নেতার ভুল হয়েছে। এই আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে হবে এই চেতনার অভাববোধ থেকে এই ঘটনা ঘটেছিল।

ঐ সময় কৃষকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেবার এক বিপুল উদ্দীপনা দেখা দেয়। কিন্তু কৃষকেরা যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে পারে এ বিশ্বাস নেতাদের মধ্যে ছিল না। ফলে, কৃষকেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়ে। এতে

আন্দোলন পিছিয়ে পড়ে। কারণ, আন্দোলনের নিয়ম হচ্ছে আন্দোলন কখনও এক জায়গায় থাকে না, হয় এগোয় না হয় তা পিছায়।

কৃষকেরা বোকা ছিল না। তারা নেতাদের ভুল নিশানা ধরতে পেরেছিল। কৃষকেরা বুঝতে পেরেছিল ধান রক্ষা এ রাস্তায় হয় না। ধান রক্ষা করতে গেলে আঘাত হানতে হবে নইলে, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

কৃষকেরা জানে, পুলিসই তাদের শত্রু। শত্রু খতম না করতে পারলে তাদের উপর আক্রমণ নেমে আসবে; তখন প্রতি আক্রমণের আর সময় থাকবে না। একথা সত্য যে সরকারের শক্তিকে সর্বদাই নেতারা বাড়িয়ে দেখেছে কিন্তু, জনসাধারণের সংগ্রামের মনোভাবকে নেতারা সর্বদাই ছোট করে দেখেছে। এই ধারণা থেকেই কৃষক নেতারা কি সিদ্ধান্ত নেবে তা পরিমাপ করতে ভ্রান্তপথে চালিত হয়েছে। এটিই সমস্ত আন্দোলনের মূল পর্য্যালোচনা।

এই ঘটনার পর ডিমলা থানায় জোতদারের পক্ষ থেকে যাদু মিঞার নেতৃত্বে কৃষকদের উপর গুলি চালনা হয়। গুলির আঘাতে তন্নারায়ণ রায় নিহত হয়, বাচ্চা মিঞাসহ অন্যান্যরা আহন হন। ফলে, মহকুমা কৃষক সমিতি থেকে নীলফামারী শহরে কৃষক সমিতির মহকুমা জমায়েত'এর ডাক দেওয়া হয় এবং সেখানে কৃষকদের আওয়াজ ওঠে যাদুমিঞার রক্ত চাই, খুনের বদলে খুন চাই।

পুলিস জানতে পারে এ ঘটনায় শহরে কৃষক জমায়েত হবে এবং তা জানা মাত্রই শহরের সমস্ত পুলিস ঐ দিন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যায়। বহু পুলিস অফিসার তাদের পরিবার কে শহরের অন্যত্রে নিয়ে যায়। পুলিসের ধারনা ছিল যে, কৃষক জমায়েত এসে মহকুমা সদর দখল করবে এবং এস. ডি. ও সাহেবেও এ ঘটনায় সদর মহকুমার সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। কিন্তু কৃষকেরা শুধু জমায়েত করেই চলে এলো, কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিলো না। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনার অভাব থেকেই এই বোধ উদ্বুদ্ধ। ফলে, আন্দোলনের গতি একই

জায়গায় থেমে থাকলো এবং তাতে শাসকগোষ্ঠী প্রতি আক্রমণেব সুযোগ পেল। যদি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে কৃষকেবা সেই সময় মহকুমা শহব দখল কবে জেলা দপ্তব দখলেব দিকে এগিয়ে যেতো তাহলে সমস্ত আন্দোলনেব চেহাবা পাল্টে যেতো। কিন্তু তা না হওয়ায় আন্দোলনেব লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে যেতে লাগলো।

বংপুব জেলাব কৃষক সমিতি কিশোবগঞ্জ থানাব অধীনে 'বড়ভিটায়' একটি জনসভাব ডাক দেয়। ঐ জনসভায় বংপুব শহবেব বেশ কিছু কংগ্রেসকর্মী যোগ দেবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবেন। ঐ কর্মী ও কংগ্রেস নেতাদেব যাবা নিতে এসেছিল তাদেব একটি সমস্যা দাড়ালো, গাড়ী আছে কিন্তু পেট্রোল নেই। শেষে পেট্রোল পাম্পে যাওয়া হলো, পাম্পেব মালিক বলেন পেট্রোল নেই, সমস্ত পেট্রোল ডি এম অধিগ্রহণ কবেছে। এ কথা শোনাব পব কৃষক কর্মীবা থানা ও এস. পি অফিসে পেট্রোলেব খোঁজে যান। এস পি. অফিসে শোনা যায় যে ডি এম সমস্ত পেট্রোল অধিগ্রহণ কবেছে, উদ্দেশ্য, সমস্ত কর্মীদেব গ্রেপ্তাব কবা হবে। এই সংবাদ পেয়ে একজন কর্মী কৃষক সমিতিব অফিসে খবব দেন যে ডি এম নির্দেশ দিয়েছে গ্রেপ্তাব কবাব, শীঘ্রই ব্যাপক ধব পাকড় শুরু হচ্ছে। এই সংবাদ কৃষক সমিতিব অফিসে পৌঁছানো মাত্র পুলিসও গ্রেপ্তাবেব জন্য তৎপব হয়ে ওঠে। জেলাব কৃষক সমিতিব প্রধান নেতাদেব ঐ বাত্রিতেই গ্রেপ্তাব কবা হয়। প্রায় তিনশ কৃষক নেতা ও পাঁচ'শ স্থানীয় কৃষক নেতা ঐ বাত্রিতেই গ্রেপ্তাব হয়। কৃষকদেব উপব শুরু হয় প্রতি-আক্রমণ। জোতদাব ও পুলিসেব মিলিত চেষ্টায় প্রচণ্ড প্রতি আক্রমণে সংগ্রামী কৃষক অসহায় হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাবা আব ধান বক্ষা কবতে পাবেনা। সমস্ত নেতা গ্রেপ্তাব হওয়াব ফলে কৃষকেবা নেতাহীন হয়ে পড়ে। ধান বক্ষাব লড়াই আবো হতে পাবতো কিন্তু তা আব হয়ে উঠল না। আন্দোলন প্রায় পঙ্গু হয়ে গেল।

পরেশ মজুমদার

জনযুদ্ধ ও পরবর্তীযুগে ডোমারে কৃষক আন্দোলন

দেশব্যাপী শক্তিশালী কৃষক ও মজুর আন্দোলনকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খতম করার পরিবর্তে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব কখনো যুদ্ধে বিপন্ন ইংরেজকে বিব্রত না করার নীতি, কখনো ব্যক্তিগত সীমিত সত্যাগ্রহ কখনো আপোস, কখনো চাপ দিয়ে কিছু ক্ষমতা আদায়ের চেষ্টা চালাতে থাকে। উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা লালপন্থীদের হাতে চলে না যায়। এই অবস্থায় ১৯৪১ সালে ফ্যাসিষ্ট বাহিনী পৃথিবীর প্রথম কৃষক মজুরের রাজ্য সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করে বসল। যুদ্ধের গতি ফিরে গেল। দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের ন্যায় ডোমার এলাকাতে আমরাও মর্মাহত হলাম। যদি দুনিয়ার কৃষক মজুররাজের এই অন্ধকারের আলো নিভে যায় তবে সবারই দুর্দিন। দেশের বহু লোকের ন্যায় স্থানীয়ভাবে আমরাও উপলব্ধি করলাম যে যেভাবেই হোক প্রথমতঃ জাপ, জার্মান ফ্যাসিষ্টদের পরাস্ত করতেই হবে, কিন্তু জনগণের হাতে তো রাজনৈতিক বা অস্ত্রের ক্ষমতা নাই, তাই অন্যান্য স্থানের ন্যায় আমাদের এলাকাতেও শ্লোগান চলল 'ফ্যাসিষ্টদের রুখতে হবে রুখতে হলে রাইফেল চাই, রাইফেল দেবে কে? জাতীয় সরকার। জাতীয় সরকার কায়েম কর, হিন্দু মুসলিম এক হও কংগ্রেস লীগ হও..........." ইত্যাদি।

এদিকে ফ্যাসিষ্টদের ক্রমাগত জয়ের মুখে বৃটিশের বরাবরের ধামাধরা হিন্দু মুসলিম কায়েমী স্বার্থপরায়ণগণ হঠাৎ জাপ, হিটলার প্রেমে মেতে উঠল। হিটলারকে তো কল্কি অবতার বলে চালু করারই চেষ্টা হতে লাগলো। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে ফ্যাসিষ্ট বিরোধীতা তাদের সহ্য হল না। আর তারা তো শ্রেণী স্বার্থেই সোভিয়েত রুশের দরদী হতে পারে না। তাই দেখা গেল মুসলিম লীগ মুসলমান কৃষককে আর হিন্দু সভার নেতাগণ হিন্দু কৃষক জোতদারকে কমিউনিষ্ট বা বামপন্থী নেতৃত্বে

কৃষক বা জোতদারবিরোধী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালাতে লাগল।

এই পরিস্থিতিতেই ডোমারে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের আয়োজন চলতে লাগল। ইতিপূর্বে ডোমার ও ডিমলা থানা এলাকায় গণ্ডী ও তোলা বন্ধ আন্দোলন চলতাবন্ধ আন্দোলন ইত্যাদির ব্যাপকতার জন্য ডোমার জেলা প্রাদেশিক নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই ডোমার, প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য স্থান নির্বাচন হয়েছিল। চতুর্দিকে সম্মেলনের প্রস্তুতি উপলক্ষে যে জমিদারী প্রথা বিরোধী ও কৃষক স্বার্থবাহী প্রচার ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে মনে হতো যেন রীতিমত শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। সম্মেলনের প্রাক্কালে স্থানীয় মুসলিম লীগ ও সঙ্গে কিছু হিন্দু সভার নেতা পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানালেন যে সম্মেলন উপলক্ষে হাজার হাজার লোক সমাগম হলে তা নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে না। অবশ্যই লুঠতরাজ হবে, অবৈধ গৃহ প্রবেশ হবে, সুতরাং তা বন্ধ হোক। ডোমার ডাকবাংলোয় পুলিস কর্তৃপক্ষ আপত্তিকারীরা এবং সম্মেলনের উদ্যোগী আমরা বৈঠক বসলাম। নিয়ন্ত্রণ রাখার ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা আমাদের আছে বলে আমরা অনেক উদাহরণ ও গ্যারান্টি দিলাম। পুলিস কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট পুলিস রাখবে বলে আশ্বাস দিল। তারপর আপত্তিকারীরা নিস্তেজ হল। যাই হোক, যথাসময়ে ঘোর বর্ষা বাদলের মধ্যেই সম্মেলন সুশৃঙ্খল ও উদ্দীপনার সঙ্গে সম্পন্ন হল। সভায় প্রাদেশিক নেতা নির্বাচিত সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী এবং আরো বহু কৃষক নেতা ও প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্থানীয় ডাঃ প্রফুল্ল সেন। সম্মেলনের সাফল্যে প্রমাণ হল, কৃষক মজুর গরীব মানুষগণ যদি নিজস্ব শ্রেণীনীতিতেই জোট বাধে এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও পাশে আসে। শ্রেণীগত জোট না থাকলে সত্যিকারের মোর্চা বা ফ্রন্ট হয় না, হলেও তাজ্জুত লেজ হয়ে থাকতে হয়।

সম্মেলনের আগে ও পরে মাসাধিক কালতো বটেই, কৃষক কর্মীদের মধ্যে ছিল রীতিমত উদ্দীপনা ও নেতৃত্বের উপর আস্থা। ঘন ঘন বৈঠক পরামর্শ রাজনৈতিক শিক্ষা, কমরেডদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া নেওয়া, কাজের উপর চেক আপ, ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা, সংশোধন, আবার কাজ। যেন বিরাট লড়াইয়ের প্রস্তুতি। এই সময় বে-আইনি কমিউনিষ্ট পার্টির অনেক কমরেডই ছদ্মনামে ডোমার এলাকায় থাকতেন। কৃষক আন্দোলনের কাজও করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী, সরোজ মুখার্জী, মনসুর হাবিব, ভাস্ত লাহিড়ী আরো অনেকে। কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী (ছদ্মনাম কালিপদ) ছিলেন প্রাণকেন্দ্র। নবীন কমরেডদের তিনি নানাভাবে শিক্ষায় ও সংগঠনের কাজে দক্ষ করে তুলতেন। বৈঠকে আত্ম-সমালোচনা ও সমালোচনা ছিল তার অপূর্ব ভালবাসা পূর্ণ। নিরপেক্ষ ও বিরোধী ব্যক্তিদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করে তাদেরকে সত্যিকারের স্বাধীনতা ও সমাজবাদের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা ছিল তাঁা অদ্ভুত। লোককে নিজ বক্তব্য শোনাবার পূর্বে স্বপ্নাচ্ছলে তাদের বক্তব্য শোনাই ছিল তাঁর বিশেষ কায়দা। রংপুরের সু-গায়ক বিনয় রায়ের গোষ্ঠী গণ-সংগীত চর্চ্চার দ্বারা গ্রামগুলোকে যেন মাতিয়ে তুলতেন। কর্মীদের প্রাণে অফুরন্ত শক্তি জাগিয়ে দিতেন। সম্মেলনের কাজে স্থানীয় কমরেডদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোলাম আজিজ, সাদামুদ্দীন অধীর সেন, যতীন কর্মকার, গিরীশ সরকার সুধীর রায়, চিত্ত রায়, চোটকু সাহা অন্যতম। সম্মেলনের সময় জলপাইগুড়ির বীরেন নিয়োগী চালিত কৃষকজাঠা, বোদার কমরেড ভোলা মজুমদার চালিত কৃষক মিছিল সৈয়দপুর থেকে, জলঢাকা, ডিমলা থেকে কৃষকদের মিছিলে মিছিলে ডোমার মুখরিত, চঞ্চল। সম্মেলন শেষে সোৎসাহে ও সুশৃঙ্খল-ভাবে জমিদারী প্রথা এবং ফ্যাসিষ্ট বিরোধীতার প্রেরণা নিয়ে কৃষকগণ নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান। ডোমারের প্রতিক্রিয়াশীলদের হৃৎকম্প উঠলেও তাদের আশঙ্কিত কোন বিশৃঙ্খলা হয় নাই সম্মেলনের আগে বা পরে।

বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ জনযুদ্ধের যুগে ফয়দা উঠানো কিছু মতলববাজ ছাড়াও, অন্যান্য স্থানের ন্যায় একদল দেশপ্রেমিক এই অঞ্চলেও আন্তরিক ভাবে চাইলেন জাপ, জার্মান সাহায্যে ইংরেজ শাসনকে উৎখাত করতে, একটি রাজনৈতিক কৌশল হিসাবেই। কিন্তু তারা জয়চাঁদের দ্বারা মহম্মদ ঘোরীর ও মির্জাফর দ্বারা ইংরেজের সাহায্য নেওয়ার ইতিহাস ভুলে যান এবং নৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন সমাজবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার শক্তি, যে অত্যাচারী বর্বর শক্তির চেয়ে বড়, তা ধারণাও করতে পারেন নাই। তাই ভুল পথে যাচ্ছিলেন তারা। পরে ফ্যাসিষ্ট জাপান, জার্মানদের পরাজয়ে তারা হিসাবের গোলমাল বুঝতে পারলেন। ডোমারে এই ধরণের দেশপ্রেমিকদের মধ্যে ছিলেন নরেন কাঞ্জিলাল, অশ্বিনী কুণ্ডু, প্রাণেশ্বর দত্ত প্রভৃতি।

ডোমারে সম্মেলন উপলক্ষে এবং সব সম্মেলন উপলক্ষেই চতুর্দ্দিকে যে প্রচার ও সংগঠন চলে, প্রকৃত সম্মেলন থেকে তার গুরুত্ব কম নয়। সে সব কাজের সময় সাধারণ কৃষক, ক্ষেতমজুর ও গ্রামবাসীর সঙ্গে প্রচারকদের সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা ও পরিচয় হয়। তাদের মনের কথা জানবার তাদের সমস্যার সত্যিকারের সমাধানের পথ দেখানোর এবং তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগানোর পক্ষে ঐ সব যোগাযোগ অনেক কাজে লাগে। কার্য্যতঃ বেশ সুযোগ দেখা গেল। মনের মত কথা শুনে ও মনের মত সংগঠক পেয়ে তাদের মধ্যে থেকে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেল, যারা গ্রামে কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে লাগলো। পরিক্রমাকালে প্রচারকদেরও প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হয় এবং আনন্দও কম হয় না, নানা কষ্ট অসুবিধার মধ্যেও। ব্যাগে চিড়া নিয়ে দিনের পর দিন কাটানো, পথে নদী বা জল পেলে গামছায় চিড়া ভিজিয়ে খাওয়া, কৃষকদের খোলামেলা ঘরে চট্ ও খড়ের বিছানায় ঘুমানো এসব কি কম মজার ? যেন গরিলারা ঘুরছে গ্রামে গ্রামান্তরে।

১৯৪৩ সাল। ফ্যাসিষ্ট বিরোধীতা চলছেই। একদিকে ইংরেজ শাসকদের দায়িত্বহীনতা, অন্যদিকে অর্থলোভী ঠিকাদার, মজুতদার ও

মহাজনদের কারসাজিতে সাধারণ মানুষেব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উধাও। লবন, কেরাসিন, চাল, ডাল অদৃশ্য। গোপনে অতিরিক্ত দাম দিলে পাওয়া যায়, যা গবীবদের নাগালেব বাইরে। এইভাবে 'অন্যান্য অনেক স্থানের ন্যায় ডোমাব এলাকায় কলেরা, বুভুক্ষা ও দুর্ভিক্ষের এলাকাতে পরিণত হলো। ছোট বন্দর, কিন্তু তবু চতুর্দ্দিক থেকে শত শত ক্ষুধার্ত ও পীড়িত মানুষ ভিড় করেছে হাট খোলাব খোলা ঘব গুলিতে।

অনাহার, ভিক্ষা, কলেবা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। বন্দরেব অধিবাসীরা আতঙ্কিত। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্মীগণের উদ্যোগে কংগ্রেস লীগ নিরপেক্ষ প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদেব নিয়ে জনমঙ্গল সমিতি গড়ে উঠল। চাঁদা আদায় দ্বারা আর্ত্তদের সেবা সাহায্য চলতে লাগল। সরকারী স্তরে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা নাই। গাছের পাতা থাকতে মায়ের সতীত্ব থাকতে নাকি দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা যায় না। সুতরাং বেসরকারী ও ঐক্যবদ্ধ চেষ্টাতে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ চলতে লাগল। কৃষক সমিতির কর্মীরা সংগঠিত ভাবে হাটে হাটে লাইন (কিউ) প্রথায় কেরাসিন বিক্রয়ের কাজ শুরু করল। কুড়ি টাকা মণ দরে চাল কিনে অনুসন্ধান করা দুঃস্থ পরিবারগুলোকে ষোলটাকা দবে তা সরবরাহ শুরু করা হল। ঘাটতি চারটাকা মণকরা আদায়ী চাঁদা দিয়ে পূরণ করা হ'তে লাগল। বাপ-মা পরিত্যক্ত অনাথ শিশুদের রক্ষার জন্য অনাথ শিশু নিকেতন গড়ে তোলা হলো। একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত দম্পতিকে দিয়ে তাদের তদারক চলল। তত্ত্বাবধানে থাকতেন সুবর্ণ চক্রবর্তী। চাউল ও কেরাসিন বিতরণে কার্ড ছাপিয়ে অভাবী পরিবারগুলোকে দেওয়া হলো যার ভিত্তিতে তারা সস্তায় ঐসব জিনিষ পাবে। তখন পর্যন্ত সরকারী কার্ডের বালাই ছিল না। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দিনেব পর দিন বেড়েই চলল। গড়ে ডোমার বন্দরে ৫/৬ জন মানুষ মারা যেতে লাগলো। মড়া ফেলার বন্দোবস্ত করা অসম্ভব ছিল। কুকুর কাক দিনে দুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায়, হাটে, নরমাংস খেতে লাগল।

অসহায় মানুষ চোখে মুখে কাপড় দিয়ে পাশ কাটায়। সমিতি পরে "এমা" নামে এক আফি-খোর ভিক্ষাবীর সঙ্গে বন্দোবস্ত সূত্রে বানিয়ে দেওয়া কাঠের চাব চাকাব এক লম্বা ঠেলাগাড়ী ক'রে তাকে দিয়ে মৃতদেহগুলি বন্দরের বাইরে কুয়াগর্তে ফেলানো শুরু করলো। মর্মান্তিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা। বহুপরে সবকাব বাধ্য হ'ল এ জি হাসপাতাল ও ল গবখানা খুলতে এবং এই সবেও কৃষক ও কমিউনিষ্ট কর্মীরা ছিল অগ্রণী।

একদিকে এইভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, অন্যদিকে গ্রাম গ্রামান্তরে কৃষক সমিতিব কাজ, সমস্তকে ছাবিয়ে তীব্র বাজনৈতিক আন্দোলন বিস্তাব হ তে লাগলো। জনপ্রিয় বাজনৈতিক শ্লোগান ছিল—"যুক্ত বাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কবা।" এতে মুসলিম লীগেব পাকিস্তানেব দাবীকে প্রতিহত কবা যেত। কারণ, মুশলিম প্রধান বাজ্যে স্বাভাবিক ভাবে তাবা স্বায়ত্বশাসন ভোগ কবত, কিন্তু একই কেন্দ্রে যুক্ত থাকতো। যদিও পবনর্তীকালে কংগ্রেস দেশ ভাগ কবতে সম্মতঃ হলো কিন্তু তখন ঐ যুক্ত রাষ্ট্রীয় প্রস্তাবে মৃত্যুবান দেখতে পেয়ে আতংকিত হয়েছিল। ডোমার থানা এলাকার কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্র স্থান ছিল হরিণাড়া, আটিয়াবাড়ী আর স্থানীয় কৃষক কমরেড তাবক রায়ের বাড়ী ছিল সেন আন্দোলনের হেড কোয়ার্টার। কৃষক মজুর সাধারণ মানুষের সংগঠিত শক্তি নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা আদায়ের চেষ্টা না করে বারবার কংগ্রেস নেতৃত্ব আপোসক্ষমতা হস্তগত করতে উদ্‌গ্রীব। ভয়, ক্ষমতা, তারা যে দেশী বুর্জ্জোয়া সামন্তবাদীদের প্রতিনিধি তাদের হাতে না এসে, ঐসব লালপন্থীদের হাতে চলে যায়। এইসব দবকষাকষির চলতি পথে পরবর্তী সময়ে ফ্যাসিষ্ট শক্তির পরাজয়ে যুদ্ধ শেষ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভারতে আরও অনেক বৃটিশ বিরোধী শক্তি দেখা দিল। যেমন, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, নৌ বিদ্রোহ, রেল ও ডাক তার ধর্মঘট ইত্যাদি। ১৯৪৫-৪৬ সাল। একদিকে এইসব রাজনৈতিক বিস্ফোরণ অন্যদিকে অন্যান্য স্থানের ন্যায় ডোমার ডিমলার

গ্রাম গ্রামান্তরেও তেভাগা আন্দোলনের প্রসার। শ্রেণী স্বার্থের ভিত্তিতে অসংগঠিত কৃষকরাও যে কীভাবে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবকে দূরে ছুড়ে ফেলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, কীভাবে ভূস্বামীদের ভয়কে অগ্রাহ্য করে প্রকাশ্যে নিজ খামারে ফসল তুলতে পারে, নির্ভীক-ভাবে তিনভাগের দু'ভাগ নিজে রেখে ভূস্বামীকে ফসলের একভাগ নিতে বাধ্য করতে পারে, তা না দেখলে সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শহর গ্রামের কৃষক শ্রমিক ও কমিউনিষ্ট ভাবধারার সমর্থক নবীন শক্তির ক্রমবিকাশ দেখে কংগ্রেস লীগ নেতৃত্ব শঙ্কিত হলো, সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদও তাই ঝট্‌পট্‌ হিন্দুস্তান পাকিস্তান নামে দেশবিভাগের শর্তেও তারা পিছুপা হলো না। এইভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেস ও লীগের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিয়ে আপোসসূত্রে ভারতে তাদেরি বাণিজিক সত্বা সুরক্ষিত করার চতুর বুদ্ধি প্রয়োগ করল।

তেভাগা আন্দোলনঃ কৃষক সমিতির সংগঠিত নেতৃত্বে বাংজোড়া ভাগচাষীদেব জনপ্রিয় দাবীই "তেভাগা চাই", "জমিদারী খতম কর", "লাঙ্গল যার জমি তার"। আপাততঃ তেভাগার দাবীই চরম। ফসল কেটে নিজ খোলানে উঠাও, জমির মালিককে ডেকে তিন ভাগের মধ্যে একভাগ নিতে বাধ্য কর, দু ভাগ ভাগচাষীর থাকবে। জমির মালিককে আরও বাধ্যকর একভাগ নিয়ে তাব রসিদ দিতে। কিছু জোতদার এই দাবী মেনে নিলো, বাকীরা আতংকিত ও অসম্মতঃ হলো।

কৃষকদের মধ্যেকার ঐক্য ও দৃঢ়তা দেখে জোতদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা গেল। এখানেও প্রমাণ পাওয়া গেল কৃষকদের একতা ও দৃঢ়তা থাকলে মধ্যবিত্ত জোতদারদের বেশির ভাগ আপোসে আসে কিন্তু কিছু সংখ্যক কায়েমীশ্রেণী সচেতন বিরোধীতা ও চক্রান্ত করতে থাকে। উদাহরণ ডিমলার কুখ্যাত জোতদার যাদুমিঞা, কোড়ামন প্রভৃতি। এদের গুলি ও গুণ্ডা বাজিতে তন্নারায়ণ নামে একজন ভাগচাষী নিহত হন। বহু কৃষক মিছিল করতে যেয়ে গুলিবদ্ধ হন। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ডোমার ডিমলার কৃষকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা যায়।

হাজার হাজার কৃষক বেরিয়ে আসে। হিন্দু মুসলমানের অদ্ভুত একতা, যা কংগ্রেসলীগ তৈরী করতে পারে নাই তা দেখা যায়। তন্নারায়ণের মৃতদেহ নিয়ে পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরবর্তী নীলফামারী মহকুমা শাসকেব কাছে এই হাজার হাজার কৃষকের সুশৃঙ্খল ও বিক্ষুব্ধ সমাবেশ। আসামী যাছু মিঞা, কোড়ামন পলাতক। মিছিল ও সমাবেশে মুহুর্মুহু শ্লোগান, যাছুমিঞার ফাঁসীচাই, কোড়ামনের মাথা চাই। আর শ্লোগান, তেভাগার দাবি মানতে হবে, লাঙ্গল যাব জমি তার, জমিদারী প্রথা খতম কর, কৃষকে কৃষকে ঝগড়া নাই, হিন্দু মুশলিম ভাই ভাই। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে ও বাজ্যে অস্থায়ী ভাবতীয় সরকার কায়েম হয়েছে। দেশ ভাগ হওয়াব মুখে। বাংলাব অস্থায়ী বাজ্য সবকাব মুখে তেভাগা সমর্থন কবেও হঠাৎ রুদ্রমূর্তিতে পুলিস লেলিয়ে দিল কৃষক নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে। সাবা বংপুব জেলায় একই দিনে ব্যাপকভাবে শত শত কৃষককর্মী গ্রেপ্তাব হলো, জেল ভরে গেল—দেখা গেল, ডোমাব ডিমলা এলাকার সংখ্যাই যেন বেশী। তেভাগার দাবী সমর্থনও মেনে নেওয়ায় ডিমলার জোতদার হবিকান্ত সরকার, সোনা রায়, মতিয়ার রহমান, লেখক স্বয়ং ও তেভাগার দাবীদার শত শত কৃষক কর্মীব সঙ্গে এঁরাও গ্রেপ্তার হলেন। রংপুর জেলে দেখা গেল যেন জেলকৃষক সম্মেলন বসেছে। কমরেড মহী বাগচী, সুধীর মুখার্জী বসন্ত চক্রবর্তী, ভাতু লাহিড়ী, মনীষ রায়, মনোঞ্জ ঘোষ আরও সব কৃষক নেতা ও কর্মী।

১৯৪৭ সালেব ১৫ই আগষ্ট সন্দেহযুক্ত দোদুল্যচিত্ত দেশবাসী বিভক্ত ভাবে স্বাধীনতা পেল। বন্দী কৃষক কর্মী ও নেতাগণ মুক্তি পেল। কিন্তু দেশী বিদেশী কায়েমী স্বার্থপবায়ণ শ্রেণী লাভবান হলো। দীর্ঘদিনেব ত্যাগ ও শ্রেণীস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হিন্দুমুসলমান কৃষক শ্রেণীও দ্বিধাবিভক্ত হলো, হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়গতভাবে পার্থক্য দানা বাধলো। পরস্পরের প্রতি অর্জিত মিলন ও ভালবাসা ছিন্ন হলো অবিশ্বাসে, ব্যাপক সংখ্যক গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী হলো; হিন্দু বাস্তুহারা ও মুসলমান বাস্তুহারার অভ্যুদয় হলো।

হিন্দুস্থানে হিন্দুকৃষক ও গরীবমানুষ আব পাকিস্তানে মুসলমান কৃষক ও গরীব সাধারণ মানুষ হতাশাগ্রস্ত। কোথায় তাদেব জমি, কোথায় সুখ, কোথায় প্রগতি? শুধু আশ্বাস আব বিশ্বাসেব বানী। শিশু বাষ্ট্রেব কৈফিয়েৎ। আব ইতিমধ্যে কায়েমী স্বার্থেব প্রতি রক্ষী নেতৃত্বকে শক্ত হয়ে গদিতে বসতে দাও। কিন্তু গরীব কৃষক এবং কৃষক আন্দোলনেব শ্লোগান ও সংগঠন ধ্বংস হলো না। মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগলো—"দেশ আভিতক্ ভুখা হ্যায়, ভুলো মত্, ভুলো মত্। দেশ আভিতক্ নংগা হ্যায়, ভুলো মত্, ভুলো মত্"।

বলরাম সাহা

তেভাগা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী কিছু কর্মীর নাম ও পরিচিতি

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে রংপুর জেলার গ্রামে গ্রামে যে অজস্র বজ্রমাণিক দিয়ে গড়া প্রাণ ফুটে উঠেছিল, তার কিছু পরিচিতি শ্রদ্ধা ও গর্বের সাথে এখানে দেওয়া হলো। এখানে ডিমলা থানার তেভাগা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের নাম ও পরিচিতি দিয়েছেন নৃপেন ঘোষ ও অন্যান্য এলাকার কর্মীদের পরিচিতি দিয়েছেন সুধীর মুখার্জী।

নগেন রায়—সৈয়দপুর থানার নগেন রায় মধ্যবিত্ত উদ্যোগী কর্মী। সৈয়দপুরের রেল ইউনিয়নের কর্মীদের আত্মগোপনের আশ্রয় ছিল তার লক্ষ্মণপুর গ্রামের বাড়ীতে।

গোরাচাঁদ বর্মণ—কালিগঞ্জ থানার এক গরীব চাষী যিনি নিষ্ঠার সাথে মার্কসবাদ-লেলিনবাদ আয়ত্বকরে কমিউনিষ্ট নেতা হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। প্রথম থেকেই সব সময়ের কর্মী। কোন আর্থিক সাহায্যের উপর ভরসা না করে পার্টিতে যোগ দেবার পর লেখাপড়া শেখেন এবং ভাল করেই আয়ত্ব করেন। পার্টির বই পড়তেন এবং পড়াতেন। সোভিয়েট পার্টির ইতিহাস (বলশেভিক) দুবার গভীরভাবে পড়েন। নিজে একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। পরে পার্টিকে দেন নিজের একটি টিনের ঘর ও গরু পার্টিকে দান করেন। 'মাগন জমি', 'মাগন হাল', 'মাগন শ্রমের' সাহায্যে অভাবগ্রস্থ কর্মীদের সাহায্য সংগঠিত করেন। মহিলা সমিতি সংগঠিত করেন। গোপন যুগে মহিলা কর্মীদের দায়িত্ব ছিল, গোপন কর্মীদের সাহায্য করা। তাঁর এলাকায় রেল ইউনিয়নের গোপন কেন্দ্র ছিল। তিনি বিশেষ সাংগঠনিক যোগ্যতার পরিচয় দেন। একটি ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। তিনি বলেন—'ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন

এর হাত থেকে নিস্তার নেই'। আত্মগোপন অবস্থায় তিনি উদরী রোগে মারা যান।

সোমরাও ওবাও—মিঠাপুকুর থানার বলদিপুকুরের একজন মাঝারী চাষী। ১৯২১ সালের জাতীয় আন্দোলনের নেতা, কৃষক আন্দোলনে সকলস্তরে নেতৃত্ব করেছেন।

আহম্মদ কবিবাজ—কৃষক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বহু নির্যাতিত নেতা। গঙ্গাচবা থানার কোনকোন্দ ইউনিয়নের অধিবাসী।

বাজেন সাধু—বয়স বৃদ্ধ মাঝাবী চাষী। বহু সংগ্রামের নির্য্যাতিত নেতা। তাঁব দবাজ গলায কায়েমী স্বার্থ বিবোধী গানে সমবেত ৫ ১০ হাজার চাষীকে উদ্বেল কবে তুলতে পারতেন। কোনকোন্দ ইউনিয়নের অধিবাসী।

বংশী বাত্যকব—কৃষক সমিতিব চা‹ ণ কবি। কোনকোন্দ ইউনিয়নেব বাসিন্দা।

বিলায়েৎ আলী—১৯৪৮-৪৯ সালে অল্প বয়স। সংগ্রামে দুর্জয় সাহসী, হাসিভবা মুখ। ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। গঙ্গাচরা থানাব অধিবাসী।

বেণী মালী—একজন আদর্শ মার্কসবাদী কর্মী। তাঁর কাছে অনেক সময় পার্টিফাণ্ড থাকতো। চরম অভাবে পড়েও তাতে হাত দিতেন না। একবার সপরিবারে অনাহারে থেকেও তার গৃহে রক্ষিত পার্টির মজুত চালে তিনি হাত দেন নাই। এমনকি ঋণ নিতেও স্বীকার করেন নাই। খুবই গরীব চাষী। সোলার কাজ কবতেন। কোনকোন্দ ইউনিয়নের বাসিন্দা।

কেনা রায়—অবস্থাপন্ন চাষী। সরকার গ্রামের বিদ্যালয়ের জন্য হাটের একটি গাছ কেটেছিলেন। এই অপরাধে জমিদারবাবু তাঁকে প্রধান আসামী করে, অশেষ নির্য্যাতন করেন। সমস্ত দমন নির্য্যাতনের মধ্যেও তিনি দৃঢ়ভাবে কাজ করেন। গঙ্গাচরা থানার বাসিন্দা।

বৈকুণ্ঠ সরকার—ধনীকৃষক। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য

আন্দোলনের সৈনিক। ঐ সময়ে বিধবা বিবাহ করে ডানাবাড়ী অঞ্চলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

জাকেয়ৎ আলি—গাইবান্ধা মহকুমার সুন্দরগঞ্জ থানার অধিবাসী। সবসময়ের কর্মী। গরীব চাষী।

বীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী—গাইবান্ধা মহকুমায় পার্টি ও কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম কর্মী।

হানিফ ভুঁইয়া ও ফয়েজ উদ্দীন—১৯৪৯ এ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল করলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়। দু'জন কমরেড পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিতে উদ্যত হলে, উভয়ে নিহত হয়। এঁরা চণ্ডিপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

ডাঃ কায়ুম—১৯২১-১৯৩০ এর স্বাধীনতা সৈনিক। কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ফুলছুরি থানার ককিপারা ইউনিয়নের অধিবাসী।

ফজলার রহমান—ধনীকৃষক। একদল নিষ্ঠাবান কর্মীসৃষ্টি তার বিশেষ অবদান। তিনি বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন করেন। তাদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই অঞ্চলের অত্যাচারী জোতদার সুরেশ রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

নির্মল বর্মণ—ছাত্রকর্মী। গাইবান্ধা কৃষক আন্দোলন ও পার্টি গঠনে বিশেষ ভূমিকা ছিল।

মনোমোহন বর্মণ—একদল নিষ্ঠাবান কর্মীর স্রষ্টা, দায়িত্বশীল নেতা। উড়িয়া ইউনিয়নের অধিবাসী।

খোয়াজ পীর—আসল ধর্মীয় পীর নন। বৃদ্ধ, গরীব কৃষক। অফুরন্ত উদ্যোগী, সৎ, নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল কৃষকনেতা। তাই তাকে বলা হত কৃষক সমিতির পীর। তার এক কথা ছিল 'রক্ত পতাকার মান রাখো'।

আবুল মোকসেদ—গাইবান্ধা থানার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা। গাইবান্ধা লোকাল পার্টি নেতা ও কৃষক নেতা।

কুতুবউদ্দীন—পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। যাঁর কাছে পার্টির নির্দেশ নিজের সংসার অপেক্ষা বড় ছিল।

নারায়ণ মোদক—১৯২১-১৯৩০ সালের জাতীয় আন্দোলনের সক্রিয় সৈনিক। থানা কৃষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। সাদুল্লাপুর থানার অধিবাসী।

রমেশ বর্মণ—বিশেষ দায়িত্বশীল কমরেড। এর বাড়ীতে একসময় গোপন জেলাকেন্দ্র ছিল।

যতীন বর্মণ—দায়িত্বশীল কমরেড। গোপন দায়িত্ব পালনকালে ধরা পড়ে জেল খাটেন। ডিমলা থানার তেভাগা আন্দোলনে যোগদান কারী কিছু কর্মীব নামও পরিচিতি।

হরিকান্ত সরকার—মাঝারি জোতদার। কৃষক সমিতি গঠনের প্রথম যুগেই ইনি যোগদান করেন। ভাললোক বলে খ্যাতি ছিল। কয়েকবছর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯৪৬ সালে আইনসভার নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। মাত্র ১৮০০ ভোটেব ব্যবধানে হেরে যান। তেভাগা আন্দোলনে তিনি ছিলেন ওখানকার কর্মীদের সর্বাধিনায়ক। তাঁর নির্দেশে ওখানকার কৃষক যেকোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে রাজী ছিলেন। এই আন্দোলনে তিনি ও তাঁর নাবালোক পুত্র কয়েক মাস বিনাবিচারে বন্দী ছিলেন। তিনি সমিতির জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

বাচ্চা মামুদ—ভাগচাষী। জোতদারের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম জোতদারদের আক্রমণ ঠেকাতে যান।

রহিমউদ্দীন—ভাগচাষী। জোতদারের গুলিতে আহত হয়েছিলেন।

কপিজ উদ্দীন—একজন ক্ষেতমজুর। কোতয়ালি থানার তপধন ইউনিয়নের বাসিন্দা। তেভাগা সংগ্রামে পুলিসের গুলিতে আহত হয়েছিলেন।

জয়নাল বাস্তকর—কুতুবপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। একজন

অস্পৃশ্য গরীব বাদ্যকর ছিলেন। তিনি হয়েছিলেন জনপ্রিয় কৃষক নেতা।

ঠাকুর বর্মণ—কোতয়ালি থানার কুতুবপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। গরীব চাষী। পুলিসের সাথে প্রত্যক্ষ লড়াই করে চরম নির্য্যাতিত হয়ে কারাভোগ করে, গরীব চাষীর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

জীতেন দত্ত—যশোহর জেলার জোতদার সন্তান রংপুর জেলায় এসেছিলেন আঁখ মারাই কলের ব্যবসা করতে। এখানে এসে কৃষক আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে, এই অঞ্চলে কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিটি আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। নির্য্যাতন, কারাভোগ, আত্মগোপন করে কাজ করা জীবনের সঙ্গী করে নেন। নোহালীপাড়া ইউনিয়নে তিনি বসবাস করেন।

দরাজউদ্দীন মণ্ডল—বাতাসন পরগণা রায়ত আন্দোলনের একজন অন্যতম নেতা। তিনিও কৃষক সভার আন্দোলনকে সত্যিকারের পথ হিসাবে গ্রহণ করে নেন। তিনি প্রাদেশিক কৃষক সভার সহ-সভাপতি ছিলেন ও পার্টির ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন। নোহালীপাড়া ইউনিয়নের অধিবাসী।

কালিচরণ বর্মণ—রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়নের এক অসাধারণ বয়স্ক, নিবেদিত প্রাণ কমরেড। প্রথম থেকে সব সময়ের কর্মী। গরীব চাষী, কোন সময় পার্টি ভাতা নেন নাই। টেকনিক্যাল কাজের দায়িত্বে ছিলেন। বিশেষ দক্ষতা ছিল।

অন্নদা রায়—যুবক, ধনী চাষী। তেভাগার নাটক রচনা করেছিলেন। সব সময়ের কর্মী, সংগ্রামী নেতা, গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী। যে কোন সময়ে গোপনে যাবার জন্য তৈরী থাকতেন। রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

নাগেশ্বর—একজন বিহারী চাষী। এর মা ছিলেন পার্টির মাসী। বাড়ীর সবাই পার্টির পরিবার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যুগে এই বাড়ীটি ছিল জেলাপার্টি কেন্দ্র, তুলনাহীন পার্টি আশ্রয়। ভুরারঘাট এলাকার অধিবাসী।

ছয়ের উদ্দিন—ধনী চাষী ও একজন বিশিষ্ট কৃষক নেতা। প্রাণোচ্ছল যুবক, প্রথম শ্রেণীর কর্মী। গ্রামীন বুদ্ধিজীবী। শ্যামপুর থানার অধিবাসী।

জানবক্স—একজন বৃদ্ধচাষী। গরীব। দৃঢ় সংগ্রামী কৃষক নেতা। শ্যামপুর থানার বাসিন্দা।

হরচন্দ্র সরকার—কালিগঞ্জ থানার অন্যতম বিশিষ্ট কৃষক সমিতি নেতা। তাঁকে গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী বলা যায়। অবস্থাপন্ন চাষী। তিনি এখানকার প্রায় সমস্ত আন্দোলনেই নেতৃস্থানীয় ছিলেন। হাটের তোলা বন্ধ আন্দোলনে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

দেবাই বর্মণ—লালমণির হাট থানার মোগল হাট ইউনিয়নের বাসিন্দা। গরীব চাষী। পার্টি কাজে উৎসগীকৃত প্রাণ। সব সময়ের কর্মী, নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে পার্টি সাহিত্য পড়বার বুঝবার জ্ঞান অর্জন করেন।

রজনী রায়—কুলাঘাট ইউনিয়নের একজন ধনী কৃষক। সাম্রাজ্য বাদী যুদ্ধ যুগে এ বাড়ীটি গোপন কেন্দ্র ছিল।

ভবেশ সোয়ার—এক প্রচণ্ড প্রাণবান, গতিশীল জনগণের নেতা। ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর, লিখতে পড়তে জানা। আদর্শ সেবা পরায়ণ। বসন্ত মহামারীর মধ্যে কবিরাজ স্কোয়াডে বাড়ী বাড়ী সেবার কাজ করেছেন। পাঙ্গা ইউনিয়নের বাসিন্দা।

মহিম বর্মণ—কৃষক আন্দোলনে একটি স্মরণীয় নাম। ১৯৪৯-৫০-এর যুগে গোপন কাজে পুলিসের তাড়ায় ট্রেনের তলায় পা কাটা যায়। সে অবস্থাতেও সাথের গোপন দলিল নষ্ট করে দিয়েছিল। কুড়িগ্রাম মহকুমার পাঙ্গা ইউনিয়নের অধিবাসী।

বিপিন ইশোর—মধ্যবিত্ত চাষী, সমস্ত রকম পর্য্যায়ে দায়িত্বশীল নেতা। ঘবিয়েল ডাঙ্গা ইউনিয়নের বাসিন্দা।

বসন্ত কুমার চক্রবর্তী—কুড়িগ্রাম মহকুমার সিনাই ইউনিয়নের ক্ষয়িষ্ণু জোতদার পরিবারের অভিভাবক। সপরিবারে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে

সহ পার্টির কাজে গোগ দেন। পরিবারটি হয় পার্টি পরিবার। তিনি ছিলেন স্থানীয় পার্টি নেতা। শিক্ষিত। একজন উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শিক্ষা গ্রহণেব এবং শিক্ষার জন্য ছিল অপরিসীম আগ্রহ। সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে অগ্রণী ভুমিকায় থাকতেন।

জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী—দেবালয় এলাকার বাসিন্দা। মধ্যবিত্ত। পার্টিব সব সসয়ের কর্মী।

মণি চক্রবর্তী—একজন ছাত্র কর্মী।

ডাঃ ইশ্বর রায়—ধনী চাষী, সামাজিক নেতা, অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাম্রাজ্যবাদী যুগ থেকে গোটা পবিবার নিয়েই পার্টিতে যোগ দেন। তার বাড়ী ছিল পার্টির বাড়ী। সিনাই ইউনিয়নের অধিবাসী।

প্রেমানন্দ রায়—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী। জনপ্রিয় নেতা, সংগঠক। - নম্র, বিনয়ী কর্মী।

নীরোদ বায়—তেভাগা লড়াইয়ের অগ্রণী কর্মী।

গনেশ ব্রজবাসী—সর্বজন শ্রদ্ধেয় কর্মী, নেতা, গরীব চাষী। অবিচল সংগ্রামী, ত্যাগী। তার সামান্য ৭ বিঘা জমি থেকে ৭ কাঠা পার্টিকে দান করেন। জমি তার হেফাজতেই থাকে। বরাবর নিষ্ঠাব সাথে চাষ করে অর্দ্ধেক ফসল পার্টিকে দিয়েছেন। সিনাই ইউনিয়নের অধিবাসী।

জগবন্ধু সরকার—এক অসামান্য কর্মী, নেতা। গরীব চাষী। গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী। অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা। নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সারা ভারত ভ্রমন করেছেন। বহু গঠনমূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। জনযুদ্ধ যুগে সক্রিয় ভাবে পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে ওয়ারেণ্ট থাকা অবস্থায় আত্মগোপন করেন। ফলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। তিনি কিছু মাত্র কাতর হন না। তার প্রায় চালাহীন বাড়ী ছিল পার্টি কমরেডদের একটি প্রিয় আস্তানা। রাজ হাট ইউনিয়নের বাসিন্দা।

ডাঃ কমলাকান্ত রায় (বর্মণ)—একজন বয়স্ক অত্যন্ত জনপ্রিয়

সামাজিক নেতা। তাঁর বাড়ীটি ছিল পার্টির বাড়ী। ১৯২১ সালে কংগ্রেস নেতা। পরবর্তীকালে ক্ষত্রিয় সমিতির নেতা, ১৯৩৮-৩৯ থেকে পার্টির নেতা, অবিচল দৃঢ়। গ্রাম্য ডাক্তার হিসাবে ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। তোলা বন্ধ আন্দোলনে পুলিত তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়েছিল। রতিপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

মজুম—গরীব চাষী। নিষ্ঠাবান জঙ্গী নেতা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যুগে কারা নির্য্যাতন ভোগ করেছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর বর্মণ—গ্রাম্য গরীব ডাক্তার। পরিবারের প্রত্যেকেই পার্টির কাজে নিয়োজিত ছিল। সব সময়ের কর্মী, দায়িত্বশীল। রাজপুর ইউনিয়নের অধিবাসী।

মহিম কবিরাজ—রাজপুরের অবস্থাপন্ন চাষী। এখানে কৃষক সমিতির গোড়াপত্তণ করেন। কারাভোগ করেন। কখনো ঝাণ্ডা ত্যাগ করেন নাই। ১৯৪৮ সালের অনিশ্চিত অবস্থায় তীব্র দমন মূলক অবস্থার মধ্যে তাঁর দায়িত্বে রাজ্য গোপন কৃষক সম্মেলন অত্যন্ত সংগঠিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

লালটু বর্মণ—গরীব ক্ষেতমজুর। কারাভোগ করেন। আসাম সীমান্ত অঞ্চলে গোয়ালপাড়াতে কৃষক সংগঠনের কাজ করেন। দীর্ঘদেহ সংগ্রামী কমরেড। দুর্ভিক্ষ মহামারী যুগে যক্ষা রোগে মারা যান। তাঁর আবেদন 'কমরেড আমি বাঁচতে চাই, ব্যবস্থা কর' ভুলবার নয়। রাজপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।

জসীমউদ্দিন মুন্সী—১৯২১ সালের খিলাফতী নেতা। তিস্তা এলাকায় ৪/৫ টি ইউনিয়নে কৃষক সমিতি সংগঠিত করেন।

শচীন বর্মণ—জনপ্রিয় নাম 'শচীন গান্ধী। ১৯৩০-এর জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য থেকে এই নাম। সামাজিক বাধা অমান্য করে নিজ কন্যার বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। সমিতি গঠনের প্রথম যুগের উদ্যোগী নেতা। ওকরাবাড়ী এলাকার বাসিন্দা।

টসুধা বর্মণ—'বিপ্লবের আগুণ জ্বালিয়ে রাখতে, সারা জীবন জেলে

রাখবো'। তিনি বাস্তবে স্বাক্ষর রেখেছেন। খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের বাসিন্দা।

ধরণী কারজি—পার্টি ফাণ্ডে একটি ছোট সুপারী বাগান দান করেন। টোগরাই হাটের অধিবাসী।

হরেন্দ্র বর্মণ—কুড়িগ্রাম থানার কাঠাল বাড়ী এলাকার একজন মধ্য কৃষক। সমিতির জন্ম থেকে একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা।

দয়ামোহন—গরীব চাষী, ক্ষেত মজুর। ১৯৩৯ সালে গোপন পার্টি সংগঠন গড়ে তোলেন। যক্ষা রোগের বলি হণ।

পনিব উদ্দীন—একজন মাঝারি কৃষক। অল্প শিক্ষিত। খুব চৌকশ কর্মী ছিলেন। বুঝবার ও বোঝাবার ক্ষমতা ছিল। গানে মাতাতে পারতেন। নিজেও রচনা করতেন। ব্রহ্মপুত্র নদীর চর অঞ্চল নিয়ে নাগেশ্বরী এবং ভুরুঙ্গামারী থানায় মৌলানা ভাসানীর সাথে মোকাবিলা করে সমিতি সংগঠন তার উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। কুড়িগ্রাম থানার অধিবাসী।

তনিব উদ্দীন মিঞা—গদাই মিঞা নামে পরিচিত। গান্ধীর ভলান্টিয়ার। ১৯২১ সাল থেকে অশ্রান্ত, অক্লান্ত, গঠনমূলক কর্মী ও সংগ্রামী। মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াছেন। ১৯২১-এর যুগের পর কৃষক-প্রজা আন্দোলনে কাজ করেছেন। প্রাণের ক্ষুধা মেটে নাই। এবারে তিনি এই লাল ঝাণ্ডায় পথ খুঁজে পেয়েছেন। মৃত্যু পর্যন্ত সে পথ চ্যুত হন নাই। তারই হাতের অক্লান্ত, নিষ্ঠাবান কর্মী যোগেশ বর্মণ। দুর্ভিক্ষের যুগে ক্ষয় রোগে মারা যান এবং কত যে বাঁচবার আকাঙ্খা ছিল। উলিপুর থানার বাসিন্দা।

শহীদ তন্নারায়ণ রায়—মধ্য কৃষক। কবিরাজীও করতেন। প্রথম থেকেই সমিতির কর্মী। জোতদারের গুলিতে নিহত হন।

অশোক রায়—মধ্যকৃষকের ছেলে। স্থানীয় নেতা ছিলেন। সব আন্দোলনেই যোগদান করেছেন।

গজেন রায়—মধ্যকৃষক। নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন।

চাটী মহম্মদ—বর্গাদার। সব সময়ের জন্য পার্টির কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। আত্মগোপন করে থাকার সময়ে তাঁকে স্ত্রী ও কন্যা হারাতে হয়। তবুও তিনি পার্টির কাজ ছাড়েন নি।

নয়মুদ্দিন—বর্গাদার। পূর্বে ডাকাত দলে ছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের সময়ে তাঁর বিশ্বাস জন্মে যে, সমাজের পরিবর্তন হবে এবং তিনি সৎজীবন যাপন করতে পারবেন। তেভাগা আন্দোলনে সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

তাহের মুন্সী—অতীতের ডাকাত রবিন হুড তাহের মুন্সী। তেভাগা সংগ্রামের বীর সৈনিক। তারই প্রভাবে এই সংগ্রামের যুগে ডিমলা থানায় চুরি ডাকাতি একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

নীলবর্মণ—মধ্যকৃষক। সব আন্দোলনেই যোগদান করেছেন।

আলীমুদ্দিন—বর্গাদার। ভালকর্মী ছিলেন।

মছির উদ্দিন—বর্গাদার। ভালকর্মী ছিলেন।

চিত্রপণ্ডিত—স্বচ্ছল গৃহস্থ। প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার ছিলেন। তার ইউনিয়নে তিনি নেতা ছিলেন।

কালাচাঁদ বর্মণ—বর্গাদার। তার ইউনিয়নে তিনি নেতা ছিলেন। ১৯৪১ ও ১৯৪৬-৪৭-এর তেভাগা আন্দোলনেও নেতৃত্ব দেন। ১৯৪১ সালে জোতদাররা গুণ্ডা নিয়োগ করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। তিনি জখম হন। সেরে উঠে আবার আন্দোলন করেন।

ভোট রো বর্মণ—বর্গাদার। ভালকর্মী ছিলেন।

দীনদয়াল বর্মণ—বর্গাদার। নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। ১৯৪১ সালে তেভাগা আন্দোলনে তিনি আঞ্চলিক নেতা ছিলেন। এই আন্দোলনে তিনি গ্রেফ্‌তার হয়ে জেলে ছিলেন।

অম্বিকা বর্মণ—গরীব কৃষক। একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন।

পোয়াতু পণ্ডিত—গরীব কৃষক। নিষ্ঠাবান নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন।

যতীন বর্মণ—ভাগচাষী। ভাল কর্মী ছিলেন।

সতীশ বর্মণ—ভাগচাষী। ভাল কর্মী ছিলেন।

খিনা মামুদ—ভাগচাষী। ভাল কর্মী ছিলেন।

বাচ্চা বর্মণ—ভাগচাষী। ভাল কর্মী ছিলেন।

হরিচরণ বর্মণ—ভাগচাষী। ভাল কর্মী ছিলেন।

বাবু মিঞা—উচ্চ মধ্য কৃষক। সারা থানায় তাঁর সুনাম ছিল। ১৯২১ সালে ডিমলার 'স্বাধীন' সরকারের দফাদার ছিলেন। নিপীড়িত শ্রেণীর পক্ষ নিয়ে লড়তেন। তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জোতদার পক্ষ যেখানেই বর্গাদারের উপর হামলা চালাতে গিয়েছে, সেখানেই তিনি তা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেছেন। তখন তিনি বেশ বৃদ্ধ। কৃষকের মুক্তির আন্দোলন তাঁর জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

পার্বতি বিশ্বাস—তেভাগা সংগ্রামের বীর সৈনিক ছিলেন।

ডালিম বর্মণ—কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

রহিম উদ্দীন—কৃষক সংগ্রামে জোতদারের গুলিতে গুরুতর আহত হন।

খিনা বর্মণ—ডিমলা ও খগা-খড়িবাড়ী ইউনিয়নের সংগ্রামী তেভাগার সৈনিক।

গজেন রায়—নেতৃস্থানীয় সংগ্রামী কর্মী।

আলিমুদ্দীন—ভাগচাষী। ভাল কর্মী ছিলেন।

মছির উদ্দিন—ভাগচাষী। ভাল কর্মী ছিলেন।

চিত্রবর্মণ—প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। ভাল কর্মী।

নজম পণ্ডিত—একটি ঐতিহাসিক নাম। মধ্যচাষী। ১৯৩০ এর জাতীয় আন্দোলনে কারাভোগ করে, কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তেভাগা আন্দোলনের সময় প্রচারে কমরেড মণিকৃষ্ণ সেনের সাথে নীলফামারী বার লাইব্রেরীতে গেলে একজন প্রবীন কংগ্রেস নেতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'নজম, ষোলআনার আন্দোলন ছেড়ে, ছয় পয়সার আন্দোলন শুরু করলে কেন'? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমরা

কৃষক আমাদের কাছে পরাধীনতার বড় নজির হচ্ছে ইংরেজের দেওয়া পর্চা। আমরা সেই পর্চা ছিঁড়েছি। আপনারা আদালতের নথি ছিঁড়ে বের হয়ে আসুন, তবেই তো ষোল আনা আন্দোলন হয়ে যাবে। উকিল বাবুরা কেহ আর উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি ডোমার থানার অধিবাসী।

তারক বর্মণ—সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন।

হরিবর্মণ—সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন।

প্রমথবর্মণ—তেভাগা আন্দোলনে কারা নির্য্যাতন ভোগী।

সমসের মিঞা—জলঢাকা থানার নির্য্যাতিত কর্মী।

সৌরেন ঘোষ—জলঢাকা থানার সক্রিয় কর্মী। নির্য্যাতিত।

অভয় বর্মণ—মধ্যচাষী, প্রাথমিক শিক্ষক। একজন ভাল কর্মী ছিলেন।

আব্দুল আজিজ—কিশোরগঞ্জ থানা এলাকার সর্বজন প্রিয় কৃষক নেতা। ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষী। পুলিশ ও জোতদারের হাতে অমানুষিক নির্যাতিত হন। দীর্ঘ মেয়াদি কঠোর কারাভোগ করেন। ১৯৪৮ সালে প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে লোহানীর বিরাট কৃষক সমাবেশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন 'আমাদের সংগ্রামে একটা আজিজ মরতে পারে, দুটা আজিজ মরতে পারে, শতশত আজিজ মরতে পারে। কিন্তু আজিজেরা কোনদিনই ফুরাবে না। ঐ দিন জোতদার গুণ্ডা পুলিশের দুটি পরিকল্পিত আক্রমণ রুখে, ৪টি গুণ্ডাকে ধরাশায়ী করে ধানের গোলা দখল করে দুঃস্থ কৃষকের মধ্যে ধান বিলি করবার পর পরবর্তী প্রস্তুতির এই সভা ছিল এলাকার প্রায় ষোলআনা মানুষের সভা।

আব্দুল সামাদ—একজন ভাল কর্মী ছিলেন। অমানুষিক নির্য্যাতন ও কারভোগ করেন।

জঞ্জালু বর্মণ—একজন ভাল কর্মী ছিলেন। অমানুষিক নির্য্যাতন ও কারাভোগ করেন।

বিষাতু বর্মণ—ক্ষেতমজুর। বহু সংগ্রামের নেতা।

ধরণী বর্মণ (বড়)—কৃষক সাংস্কৃতিক দলের নেতা। তাঁর স্বরচিত গানের প্রচণ্ড শক্তি। ১০ হাজার মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে শুনেছে। কোন মাইক ছিল না।

ধরণী বর্মণ (ছোট)—কৃষক সাংস্কৃতিক দলের নেতা।

যোগেন বর্মণ—কিশোরগঞ্জ থানার কৃষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। দুরন্ত ক্যানসার রোগ তাকে অকালে ছিনিয়ে নেয়।

যোগেন সরকার—বৃদ্ধ। বহুসংগ্রামের নেতা।

আব্দুল গফুর—দিনমজুর। একজন ভাল কর্মী।

রিয়াজ উদ্দীন—গরীব চাষী। কৃষক আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী।

প্রভু দয়াল—গরীব চাষী। কৃষক আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী।

বাহার উদ্দীন—একজন ভাল কর্মী।

মছির মিঞা—একজন ভাল কর্মী।

লাকু ওরাও—মধ্যচাষী। একজন ভাল কর্মী।

ভাওয়াই মিঞা—অবস্থাপন্ন চাষী। তেভাগা সংগ্রামের সৈনিক।

আব্দুল রহমান—গরীব চাষী। একজন ভাল কর্মী।

লালবিহারী দাশ—মধ্যবিত্ত কৃষক। তেভাগা সংগ্রামের সৈনিক।

লুৎফর রহমান—মাঝারী চাষী। একজন ভাল কর্মী।

উপেন বর্মণ—গরীব চাষী। একজন ভাল কর্মী।

আখতার হোসেন—একজন ভাল কর্মী।

এরফান আলী—একজন ভাল কর্মী।

মুকবুল হোসেন—বদরগঞ্জ থানার ধনী চাষী। একজন ভাল কর্মী।

তায়েজ উদ্দীন—বাস্তুকরের ছেলে। তেভাগা সংগ্রামের সৈনিক।

লক্ষ্মীটারী—সংগ্রামী জোয়ান। ভাল কর্মী।

বৃন্দাবর্মণ—মাঝারী চাষী। ১৯৪৯ সালে জোতদার গুণ্ডা বাহিনীর আক্রমণ রুখে ওদের ঘায়েল করেন।

বিলায়েৎ হোসেন—একজন ভাল কর্মী।

ভরত বর্মণ—দুর্দান্ত সাহসী যুবক। ভাল কর্মী।

শরৎ বর্মণ—দুঃস্থ কৃষক। ভাল কর্মী।

মথুর মিস্ত্রী—সাহসী যুবক। তেভাগা সংগ্রামের সৈনিক।

মহেশ বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

ভোজন বর্মণ—ভাল কর্মী। গঙ্গাচরা থানার কোনকোন্দ ইউনিয়নের বাসিন্দা।

সীতা কবিরাজ—দুর্ভিক্ষ মহামারীতে এঁর নিঃস্বার্থ সেবা ভুলবার নয়।

আষারু বর্মণ—ক্ষেতমজুর। একজন ভাল কর্মী।

টোকনা বর্মণ—ক্ষেতমজুর। ভাল কর্মী।

যোগেশ বর্মণ—মধ্যচাষী। একজন ভাল কর্মী।

মহীম সরকার—মধ্যচাষী। একজন ভাল কর্মী।

বিপিন বর্মণ—সাধারণ চাষী। একজন সক্রিয় কর্মী।

বেনীকান্ত বর্মণ—সাধারণ চাষী। একজন ভাল কর্মী।

ভুবন বর্মণ—চরতা বাড়ী এলাকার একজন কৃষক কর্মী। তেভাগার সৈনিক।

উপেন বর্মণ—চন্দনপটি গ্রামের কৃষক কর্মী। তেভাগার সৈনিক।

গিরিশ সরকার—একজন ভাল কর্মী।

প্রাণহরি বর্মণ—কমলাবাড়ী এলাকার কৃষক কর্মী। তেভাগার সৈনিক।

ক্ষিরোদ বর্মণ—একজন ভাল কর্মী। যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়।

মুকুন্দ সরকার—একজন ভাল কর্মী।

লক্ষ্মণ বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

টয়রা বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

কৈলাশ বর্মণ—ভাল কর্মী। পার্টির সক্রিয় নিষ্ঠাবান সেবক।

কামরূপী যজমানি ঠাকুর—একজন ভাল কর্মী।

দুর্গাভগবতী—একজন ভাল কর্মী।

পুষ্পঠাকুর—একজন ভাল কর্মী।

পয়বা বর্মণ—পার্টির নিষ্ঠাবান সেবক।

মথুর বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

কাশীকান্ত বর্মণ—গরীব চাষী। একজন ভাল কর্মী।

সদানন্দ বর্মণ—মধ্যচাষী। ভাল কর্মী।

যতীন দাস—মধ্যচাষী। ভাল কর্মী।

হরিমোহন বর্মণ—মধ্যচাষী। পার্টিব সর্বসময়েব কর্মী।

কেদার রায়—মধ্যচাষী। একজন ভাল কর্মী।

দোলগোবিন্দ বর্মণ—গরীব চাষী। সক্রিয কর্মী।

যতীন মাষ্টাব—গবীব চাষী। গ্রাম্য বুদ্ধিজীবী। একজন সক্রিয় কর্মী।

শান্তনু কবিবাজ—মাঝাবি কৃষক। একজন ভাল কর্মী।

খেরু বর্মণ—বর্গাচাষী। একজন ভাল কর্মী।

আয়ান উদ্দীন—গবীব চাষী। তেভাগার সৈনিক।

জমির উদ্দীন—মাঝারী কৃষক। কুতুবপুব ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী।

তবাবক আলি—একজন ভাল কর্মী।

নজরুল হোসেন—গবীব চাষী ভাল কর্মী।

বানারসী রায়—অবাঙ্গালী চাষী। তেভাগার সৈনিক।

মোহাম্মদ হোসেন—অবস্থাপন্ন চাষী। একজন ভাল কর্মী।

তবারক আলী—মিঠাপুকুর থানার একজন ভাল কর্মী।

ওসমান আলী—ক্ষেতমজুর। একজন ভাল কর্মী।

ইদ্রিশ লোহানী—ছাত্রনেতা।

ক্ষিরোদ বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

নন্দবর্মণ—ক্ষেতমজুর। একজন ভাল কর্মী।

জনক ঠাকুর পুরোহিত—গরীব চাষী। তেভাগার সৈনিক।

অভয় বর্মণ—একজন ভাল কর্মী। গরীব চাষী।

কামাখ্যা বর্মণ—গরীব চাষা। একজন ভাল কর্মী।

শরৎরায়—ধনী চাষী। পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী।

মিনহাজ উদ্দীন চৌধুরী —অবস্থাপন্ন শিক্ষিত কর্মী।

কুতুব উদ্দীন চৌধুরী—মধুপুর এলাকার একজন ভাল কর্মী।

দেবেন্দ্র বর্মণ—স্থানীয় নেতা। মধ্যচাষী।

হরানন্দ বর্মণ— ক্ষেতমজুর নেতা।

ফাগুনা বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

অনন্তশীল —একজন ভাল কর্মী।

বানী বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

কণক বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

মহিম বর্মণ —একজন ধনী কৃষক। পার্টির সক্রিয় কর্মী।

হরচন্দ্র বর্মণ—ক্ষেতমজুর। ভাল কর্মী।

বিপিন বর্মণ—ক্ষেতমজুর। ভাল কর্মী।

গোন্দা কবিরাজ—মাঝারী কৃষক। ভাল কর্মী।

কমলা বর্মণ—মাঝারী কৃষক। ভাল কর্মী।

গুরুচরণ শীল—মধ্য চাষী, কবিরাজ এবং দায়িত্বশীল নেতা।

ললিত শীল—ভাল কর্মী।

হরিবোলা সরকার—ধনী কৃষক। একজন ভাল কর্মী।

স্বর্ণকার আব্দুল আজিজ বানিয়া—একজন ভাল কর্মী। কুলাঘাট ইউনিয়নের অধিবাসী।

জব্বর আলি—গরীব চাষী। দায়িত্বশীল কর্মী।

তরণী বর্মণ—গরীব চাষী। দায়িত্বশীল কর্মী।

মহেশ বর্মণ—মধ্য চাষী। ভাল কর্মী।

কামিনী দেউরী—ঘরিয়েল ডাঙ্গা ইউনিয়নের অধিবাসী। ভাল কর্মী।

গিরিশ সরকার—একজন ভাল কর্মী।

যতীন সরকার—অবস্থাপন্ন কৃষক। ভাল কর্মী।

নৃপেনদেব—একজন ভাল কর্মী। মধ্য চাষী।

ত্রৈলক্য রায়—মধ্য চাষী। ভাল কর্মী।

সুখরঞ্জন দে—মধ্যবিত্ত কর্মী।

মণি দেও—গরীব চাষী। ভাল কর্মী।

কেরু বর্মণ—তেভাগা সংগ্রামের সৈনিক। মধ্য চাষী।

বেণী বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

নীলচাঁদ বানিয়া—হিরামানিক এলাকার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা।

নিত্যানন্দ ব্রজবাসী—মৃত্তিঙ্গা এলাকার একজন ভাল কর্মী।

নগেন সেন—একজন ভাল কর্মী।

নরেন্দ্র দেও—টোগরাই হাট সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, নেতা।

ডাঃ সমসেরউদ্দীন—একজন ভাল কর্মী। ১৯২১ এর কংগ্রেস খিলাফৎ কর্মী। প্রথম যুগে ছিলেন।

কিসমৎ মিঞা—কুড়িগ্রাম ইউনিয়নের অধিবাসী, ভাল কর্মী।

বিশ্বম্ভর সাহা—মোগালবাসা ইউনিয়নের একজন ভাল কর্মী।

বিভূতি চক্রবর্তী—মধ্যবিত্ত। ভাল কর্মী।

জহুরউদ্দীন—ক্ষেতমজুর জঙ্গী কর্মী সংগঠক।

সুরেশ রায়—দুর্গাপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। ধনী কৃষক। নেতা।

প্রাণকৃষ্ণ বর্মণ—ক্ষেতমজুর। ভাল কর্মী।

সুর্যকান্ত বিশ্বাস—ভাল কর্মী।

কালিপদ বর্মণ—ছাত্র অবস্থায় দুর্ভিক্ষের যুগে পি. আর. সি. কেন্দ্রের একজন আন্তরিক কর্মী হিসাবে কাজ করেন।

গওছল হক—একজন ভাল কর্মী।

ফকির উদ্দীন—তেভাগার সৈনিক।

মজিবর রহমান—একজন ভাল কর্মী।

উমর খান—একজন ভাল কর্মী।

কারাজ উদ্দীন—দায়িত্বশীল কর্মী।

কসিউল ইসলাম মণ্ডল—একজন ভাল কর্মী।

আবুল বাসার মণ্ডল—একজন ভাল কর্মী।

রমজান আলী—একজন ভাল কর্মী।

ব্যাংশেখ—চণ্ডিপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। ভাল কর্মী।

গিয়াস উদ্দীন—একজন ভাল কর্মী।

ললিত কর্মকার—একজন ভাল কর্মী।

বোচা কর্মকার—একজন ভাল কর্মী।

জগন্নাথ চক্রবর্তী—মধ্যবিত্ত কর্মী।

মেহার শেখ—তেভাগার সৈনিক।

খোণ্ডকার আকতার উদ্দীন—তেভাগাব সৈনিক।

নরেশ রায়—তেভাগাব সৈনিক।

জগৎ বর্মণ—তেভাগার সৈনিক।

অমর রায়—তেভাগাব সৈনিক।

জাফায়েৎ আলি—একজন ভাল কর্মী।

আশহাফ আলি—একজন ভাল কর্মী।

দিদার মাহমুদ—দায়িত্বশীল কর্মী

রইচ উদ্দীন—দায়িত্বশীল কর্মী

করম তুল্যা—দায়িত্বশীল কর্মী।

আব্দুল রহিম—ক্ষেতমজুর। একজন ভাল কর্মী।

ভবেশচন্দ্র বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

প্রিয়নাথ বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

টিকিন বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

যতীন রায়—তেভাগার সৈনিক।

মুকুন্দলাল বর্মণ—তেভাগার সৈনিক।

আফান উদ্দীন—তেভাগার সৈনিক।

করিম উদ্দীন—একজন ভাল কর্মী।

আপিন্ন উদ্দীন—ভাল কর্মী।

দেলোয়ার রহমান—দায়িত্বশীল কর্মী।

কাচিন উদ্দীন—ভাল কর্মী।

খেজের উদ্দীন—ভাল কর্মী।

মনিন্দ্রচন্দ্র বর্মণ—তেভাগার সৈনিক।

মফিজ উদ্দীন—গরীব চাষী। ভাল কর্মী।

বেণীমাধব বর্মণ—তেভাগার সৈনিক।

মহঃ মহসীন—তেভাগার সৈনিক।

বসরত মুন্সী—তেভাগার সৈনিক। ফুলছুবি থানার অধিবাসী।

খাজের পীর (বড়)—একজন ভাল কর্মী।

হরেন্দ্র বর্মণ—পার্টির হোলটাইমার।

নয়ান বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

বাদল ভট্টাচার্য্য—মধ্যবিত্ত কর্মী। নেতা।

জব্বার আলি—একজন ভাল কর্মী।

আবুল মহফুজ—একজন উদ্যোগী কর্মী।

আবুল ফজল—সব সময়ের কর্মী।

আকবর আলি—একজন ভাল কর্মী। পার্টির নির্দেশ নিজের সংসার অপেক্ষা বড় ছিল।

আবতাজ আলি—পার্টির নির্দেশ নিজের সংসার অপেক্ষা বড় ছিল।

কুতুব উদ্দীন—পার্টির নির্দেশ নিজের সংসার অপেক্ষা বড় ছিল।

আব্দুল আজিজ—সব সময়ের কর্মী।

ভবেশ মহন্ত—একজন ভাল কর্মী।

আলতাফ আলী—একজন ভাল কর্মী।

ইয়াছিন উদ্দীন—একজন ভাল কর্মী।

জগৎ বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

সতীন রায়—একজন ভাল কর্মী।

নগেন রায়—একজন ভাল কর্মী।

যোগেশ বর্মণ—কাপাসিয়া ইউনিয়নের অধিবাসী। ভাল কর্মী।

যতীন্দ্রমোহন রায়—শ্রীপুর ইউনিয়নের একজন ভাল কর্মী।

কামিনীকুমার রায়—শ্রীপুর ইউনিয়নের একজন ভাল কর্মী।

আকবর আলি—একজন ভাল কর্মী।

আব্দুল মজিদ—একজন ভাল কর্মী। ক্ষেতমজুর।

ললিতচন্দ্র বর্মণ—একজন ভাল কর্মী।

নগেন্দ্র নারায়ণ রায়—দায়িত্ব শীল কর্মী।

অমরেন্দ্র রায়—একজন ভাল কর্মী।

উপেন্দ্র রায়—একজন ভাল কর্মী।

অমরচন্দ্র রায়—একজন ভাল কর্মী।

মহিম বৈরাগী—একজন ভাল কর্মী।

মহিমারঞ্জন মহান্ত—একজন ভাল কর্মী।

হেমন্তকুমার রায়—দায়িত্বশীল কর্মী।

ডাঃ কালিকান্ত—রায়িত্বশীল কর্মী

মহিলা কর্মী :—

দীপ্তি রায়চৌধুরী—বীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর স্ত্রী। গাইবান্ধা মহকুমায় পার্টি ও কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠায় এঁর অবদান ভুলবার নয়।

বিজলীপ্রভা গোস্বামী—একজন ভাল কর্মী।

শচীরানী দেবী—সুন্দরগঞ্জ থানার বাসিন্দা। ভাল কর্মী।

রেবা রায় (চৌধুরী)—দুর্ভিক্ষের সময় রিলিফের কাজে সাহায্য সংগ্রহের উদ্দোশ্যে একটি সাংস্কৃতিক স্কোয়াড গঠিত হয়। ঐ দলের অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

মহাশ্বেতা দেবী—বিশিষ্টা লেখিকা। সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের একজন কর্মী ছিলেন।

বেগম কায়ুম—ফুলছুরি থানার ককিপাড়া ইউনিয়নের ডাঃ কায়ুমের স্ত্রী। কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

লক্ষী বর্মণ—রতিপুর ইউনিয়নের ডাঃ কমলাকান্ত বর্মণের স্ত্রী। তিনি ছিলেন পার্টির বৌদি।

দয়াময়ী বর্মণী—রাজপুর ইউনিয়নের মধুবাম এলাকার গ্রাম্য ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর বর্মণের স্ত্রী। পার্টির সব সময়ের কর্মী।

অন্নপূর্ণা দেবী—সিনাই ইউনিয়নেব অধিবাসী। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যুগ থেকে মহিলা কর্মী এবং মহিলা সমিতিব নেত্রী।

মাধবী রায়—সিনাই ইউনিয়নের বৈত্তেব বাজাব এলাকাব ডাঃ ঈশ্বর রায়ের স্ত্রী। পার্টির সব সময়েব কর্মী।

খরকী বর্মণী—বদরগঞ্জ থানাব হাবিয়া কুটি এলাকায জঙ্গী ক্ষেত-মজুব মহিলা কর্মীবাহিনী গড়ে উঠে। তাব সংগঠক ছিলেন। ভাল কর্মী।

রাজবালা বর্মণী—একজন ভাল কর্মী।

মোহিনী বর্মণী—সংগ্রামী জঙ্গী মহিলা কর্মী।

নিবোদা বর্মণী—সংগ্রামী জঙ্গী মহিলা কর্মী।

বানী মুখার্জী—সুধীব মুখার্জীব স্ত্রী। একজন ভাল কর্মী।

স্মৃতিচারকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মণিকৃষ্ণ সেন

জন্ম ঃ ১ অক্টোবর, ১৯০২। পিতা প্রয়াত বেণীমাধব সেনগুপ্ত মাতা প্রয়াতা প্রমদা সুন্দরী সেনগুপ্ত। জন্মস্থান রংপুর। শিশু অবস্থায় অকালে পিতৃবিয়োগ হয়। স্নেহময়ী মাতা প্রমদা সুন্দরীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অগ্রজ প্রয়াত শিবকৃষ্ণ সেনের তুলনাহীন স্নেহ ও বিরাট আত্মত্যাগে মানুষ হন। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে যোগদেন। ১৯২৯ সালে আইনপাশ করেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে জেলার 'ডিক্টেটর' হন, 'তদানীন্তন কংগ্রেসের সংগ্রামী রণকৌশল অনুযায়ী। ঐ সময় কংগ্রেস পার্টি বেআইনি প্রতিষ্ঠান এবং পার্টির গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজের সুযোগ কম ছিল। কাজেই একজন গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী 'ডিক্টেটর' মনোনীত করতে হয়'। এই পরিস্থিতিতে তাঁর ৬ মাস কারাদণ্ড হয়। পরে, দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের প্রাক্‌কালে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে পুনরায় গ্রেপ্তার করে রাজপুতনার দেউলিবন্দী শিবিরে তাঁকে বিনা বিচারে আটক রাখেন। সেখান থেকে ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে মুক্তি পান। ঐ সালেই কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৯ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। তখনকার দিনে অন্যপার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পার্টি সভ্যপদ পেতে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভের দ্বিতীয় দিনেই পুনরায় আটক হন। পরে জামিনে মুক্তি পেয়ে নিজগৃহে অন্তরীন থাকেন।

অবিবাহিত। নেশা ও পেশা রাজনীতি। বর্তমান ঠিকানা ঃ মুলাটোল ডাকঘর ও জেলা রংপুর।

অবনী বাগচী

জন্ম ঃ ১৯০৯ সাল। পিতা প্রয়াত যামিনীকান্ত বাগচী, মাতা প্রয়াতা শৈলবালা বাগচী। জন্মস্থান রংপুর। শৈশবে মাতুলালয়ে

রাজনীতির প্রেরণা পান। কালীপদ বাগচী, সতীনগুহ, বাণীবাগচী প্রমুখের উৎসাহে যুগান্তর পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পরে ঐ পার্টির নেতৃত্ব দেন। ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে নীলকামারী ট্রেনডাকাতির অভিযোগে বন্দী হন। জেলখানায় বামরাঘব লাহিড়ী, শিবদাস লাহিড়ী, পিটটু গুহ প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের সাহায্যে কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে ১৯৩৬ সালে জেলেই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ কবেন। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে জেল থেকে মুক্তি পান এবং ১৯৩৮ সালের প্রথমে পুনরায় কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি রংপুর জেলার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সদস্য ও জেলা কমিটিব সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে রংপুর শহরে রংপুর জেলা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান সংগঠক রূপে দীনেশ লাহিড়ী, আবু হোসেন সরকার (যিনি পরে মুখ্যমন্ত্রী হন), শচীন ঘোষ প্রভৃতির সাথে তিনিও ছিলেন। দীনেশ লাহিড়ীর কাছেই কৃষক আন্দোলনেব হাতেখড়ি দেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে বগুড়া, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ (প্রাদেশিক কমিটি) প্রভৃতি জেলার তিনি সংগঠক ছিলেন। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সালের জুন মাস পর্যন্ত আবারও তিনি আত্মগোপন করেন। ১৯৫১ সালে ঢাকায় পুর্বপাকিস্থান কমিউনিষ্ট পার্টির খোকারায়, নেপালনাগ, বারীন রায়, মনসুর হাবিব প্রমুখের সাথে তিনিও প্রথম তিন মাস সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। পরে, ভারতবর্ষে চলে আসেন সেই সাথে নিয়মমাফিক পার্টি সদস্যপদও ট্রান্সফার করে আনেন। ১৯৫৫ সাল থেকে পশ্চিমদিনাজপুর জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক মণ্ডলীর আমন্ত্রিত সদস্যরূপে এবং জেলাকমিটির একজন সক্রিয় সভ্যরূপে নিযুক্ত রয়েছেন। ১৯৭৮ সালে বালুরঘাট উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পদ থেকে তিনি অবসর নেন। বর্তমান ঠিকানা ঃ শিবতলী [illegible], ডাকঘর ঃ বালুরঘাট, জেলা ঃ পশ্চিমদিনাজপুর।

সুধীর মুখার্জী

জন্ম ঃ ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯১২। পিতা প্রয়াত সতীশচন্দ্র মুখার্জী, মাতা প্রয়াতা কুসুমকুমারী মুখার্জী। জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল। শৈশব ও স্কুলজীবন কেটেছে রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম পল্লী শহরে। ১৯২১ সালে বিপুল জাতীয় অভ্যুত্থান জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রথাকাকালীন বিপ্লবী দলের কিরণদাস, জগদীশ মজুমদার প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। অনুশীলন সমিতির তৎকালীন ছাত্রযুব নেতা বীরেন দাসগুপ্তের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ১৯২৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ঢাকায় চলে যান। সেখানে শ্রীসঙ্ঘের পার্টির ছেলেদের সাথে পরিচয় হয় এবং প্রয়াত অনিলরায়ের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কাশীতে পড়তে যান। সেখানে দু'জন কমিউনিষ্ট সহপাঠী পান। একজন বর্ত্তমান সাঠে, অন্যজন পুণার ডি. পি. যোশী। এঁদের সাহায্যে কমিউনিষ্ট Study circle-এ যোগ দেন এবং মার্কস্‌বাদ গ্রহণ করেন। এ সময় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল। তিনি তাঁদের সাথে অর্থ সংগ্রহে যেতেন। কাশীতে সিংহলের ভিক্ষু সরনাংকরের সাথে পরিচয় হয়। তিনি শ্রী সঙ্ঘের সভ্য ছিলেন, পরে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। এরপর ঢাকায় চলে আসেন। মার্কস্‌বাদ মতামত গ্রহণের জন্য তাঁকে বিভিন্ন অসুবিধায় পড়তে হয় এবং ঐ সময় নানা অভিযোগে ঢাকায় তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন। বিশিষ্ট নেতা ও ব্যবহার জীবি শ্রীশ চ্যাটার্জী তাঁর পক্ষে দাড়িয়েছিলেন। এই মামলায় অধ্যাপক চারু ব্যানার্জী গভঃ স্বাক্ষী হয়েও তাঁর অনুকুলে বক্তব্য রাখেন। জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে কমরেড মোজাহফ্‌র আহ্‌মদের সাথে দেখা করে এসে তিনি রংপুর কম্যুনিষ্ট গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে পার্টির কাজ করেন ; পরে জেলা কমিটির সভ্য হন। এর কিছু দিন পরে ভারত রক্ষা আইনে ৯ মাস জেলে বন্দী থাকেন। জেলখানা থেকে ছাড়া পাবার পর কিছুদিন রংপুর জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

জনযুদ্ধ যুগে পার্টি প্রকাশ্য হলে প্রথম পার্টি সম্মেলনে তিনিই জেলা সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন। পরে প্রাদেশিক কমিটির সংগঠক হয়ে মেদিনীপুরের দায়িত্ব নিয়ে চলে যান। আগষ্ট আন্দোলনের যুগে কিছুদিন কলকাতার ছাত্র আন্দোলনে আংশিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পুনরায় বন্দী হন এবং ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তি পান। ১৯৪৮ সালে অন্তরীণ হন এবং বিভিন্ন অভিযোগে ১৮৯৯ সালে আবারও বন্দী হয়ে ১৯৫৬ সালের শেষে মুক্তি পান এবং কিছুদিন পরে ভারতবর্ষে চলে আসেন। 'রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি' শিরোনামে তিনি ও নৃপেন ঘোষ একত্রে একটি বই লেখেন। বর্তমান ঠিকানা: ব্যাণ্ডেল, কাজডাঙ্গা, ডাকঘর: দেবানন্দপুর, জেলা হুগলি।

নৃপেন ঘোষ

জন্ম: ৬ই মার্চ, ১৯১৫। পিতা প্রয়াত ললিত মোহন ঘোষ মাতা প্রয়াতা সরোজ বাসিনী ঘোষ। জন্মস্থান: রংপুর। মাত্র ১১ বছর বয়সে যুগান্তর পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩২ সালে আই এস সি ক্লাশে কেবল প্রবেশ করেছেন, সে সময়ে আত্মগোপন করেন। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ধরা পড়ে বিনা বিচারে আটক থাকেন। ১৯৩৭ সালে মুক্তি পান এবং কৃষক আন্দোলন ও রংপুর শহরের মেথর আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪২ সালে লোকাল কমিটির সদস্য হন এবং ঐবছরেই জেলা পার্টির প্রকাশ্য সম্মেলনে ডি সি ও নির্বাচিত হন। কিছুদিন জেলা কমিটির সম্পাদক ও ছিলেন। রংপুর জেলার ডিমলায় তিনি তেভাগা সংগ্রাম পরিচালনা করেন। প্রশ্ন রেখেছিলাম, রাজনীতির শিক্ষা লাভ করেছেন কার কাছে? উত্তরে জানান যে, "যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেন, তুমি রাজনীতি শিখেছ কার কাছে? আমি উত্তর দেব, অর্দ্ধেক আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট নেতাদের বই থেকে আর অর্দ্ধেক কৃষক মজুরের কাছ থেকে।" অবিবাহিত। বর্তমান ঠিকানা: ১০ শক্তিগড়, যাদবপুর, কলকাতা-৩২।

পরেশ মজুমদার

জন্ম ঃ ১৯০৯ সাল। পিতা প্রয়াত অম্বিকারঞ্জন মজুমদার, মাতা প্রয়াতা অরুণবালা দেবী। জন্মস্থান ঃ রংপুর। জমিদার আশুতোষ মজুমদারের নাম বললে এক সময় বহু দবদূরান্তের মানুষেরাও চিনতেন। রংপুরের জমিদার বাড়ীর ছেলে পরেশ মজুমদার, যিনি মন্টু মজুমদার ডাক নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে যুগান্তর পার্টির সংস্পর্শে আসেন, পরে কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। তেভাগা আন্দোলনের সময় কালীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও জলঢাকা এলাকায় নেতৃত্ব দেন। দেশ ভাগের পব ভারতবর্ষে চলে আসেন। ১৯৩০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। বর্তমান ঠিকানা ঃ আমবাগান কলোনী ডাকঘর ঃ ইসলামপুর, জেলা ঃ পশ্চিমদিনাজপুর।

বলরাম সাহা

জন্ম ঃ ১৯০৯ সাল। পিতা প্রয়াত তারিনীমোহন সাহা, মাতা প্রয়াতা যশোদা সাহা। জন্মস্থান ঃ ডোমার, রংপুর। শৈশবে স্বর্গীয় শম্ভুনাথ সাহার কাছে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের জীবন কাহিনীর প্রভাব বিশেষ করে হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রহ্লাদের দ্বারা প্রজার পক্ষে গোপনে প্রতিরোধ সংগঠন, কৌশলে মুক্তি পাওয়া, গোপনে গোপনে প্রজাবিদ্রোহ সংগঠন, অত্যাচারী রাজা পিতার বিনাশ, এসব কাহিনী তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় শিক্ষক ভবতোষ রায়ের কাছে ক্লাশে ও ক্লাশের বাইরে বিবেকানন্দের জীবনের ব্রহ্মচর্য পালন, জনসেবা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা শুনে মনে গভীর রেখাপাত করে। যার সুদূর প্রভাবে পরবর্তী জীবনে কমিউনিষ্ট ভাবার্দশ গ্রহণ। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেন যে, সামন্তবাদী তথা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ঠিক ঠিক ও পুরোপুরি জনসেবা ও জনস্বার্থ রক্ষা করা যায় না, সমাজ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেই তা সম্ভব। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের উপর নির্ভর করেই। ১৯৩০ সালে লবন আইন অমান্যের আন্দোলনে জড়িত

হওয়ায় কলেজে পড়ায় বিঘ্ন হয়। ঐ সময় তাঁকে ৭ দিনের জন্য জেল খাটতে হয়। ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে অন্তরীণ ও একমাস জেলা থেকে বহিষ্কার হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই ১৯৩৩-৩৪ সাল থেকেই তিনি সোসালিস্ট-কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শের সমর্থক হয়ে পড়েন। গোটা রংপুর জেলাতেই কংগ্রেস ছিল তখন প্রায় টেরবিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট পন্থীদের প্রভাবাধীন। ফলশ্রুতিতে, অন্যান্য স্থানের মত রংপুরেও শ্রেণীস্বার্থে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী গ্রুপ সৃষ্টি হলে অন্যান্য অনেক সমভাবাপন্নের মত তিনিও কম্যুনিষ্ট গ্রুপে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৩৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। দূর্ভিক্ষকালে জনসেবার মাধ্যমে তৎকালীন জেলা কমিউনিষ্ট নেতা রথীন গাঙ্গুলীর বিশেষ প্রেরণায় ১৯৪৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্বে দিতে দিয়ে ৬ মাস কারাবরণ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে মুক্তি পান। এরপর অবাঞ্ছনীয় দেশ-ভাগের পরিস্থিতিতে প্রিয় জন্মস্থান পরিত্যাগ ও ভারতে আগমন। বর্তমান ঠিকানা : ১৮ শক্তিগড়, ডাকঘর : শিলিগুড়ি বাজার, জেলা : দার্জিলিং।